৫৩-৫৪
দুই খন্ড একত্রে
জংলী মেয়ে
রোমেনা আফাজ
বেলাল
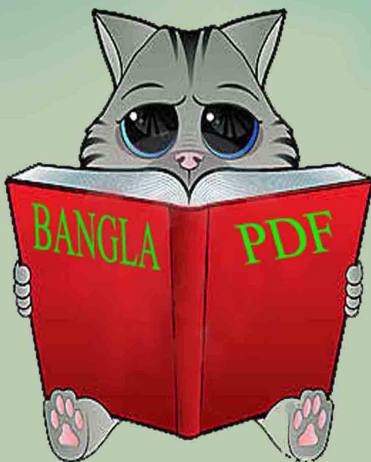
এই সিরিজের পরবর্তী বই

নীল পাথর

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায়ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন বনহুর।

বিজয়াও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বুড়ীকে প্রথমে যতখানি কঠিন মনে হয়েছিলো ঠিক ততখানি নয় সে। বুড়ীও বসলো তাদের ওপাশে। আপন জনের মত বললো—কোথা থেকে তোমরা এসেছো বাছা?

বনহুরই জবাব দিলো—বহু দূরদেশ থেকে।

ও এবার বুঝেছি, জাহাজডুবি হয়েছিলো। মেয়েটা তোমার বৌ। বাঃ বেশ মেয়েটি তো। সুন্দর মানিয়েছে তোমাদের দু'জনাকে। থাকো, যতদিন খুশী থাকো তোমরা। চম্পা বড় শয়তান মেয়ে, একদণ্ড ঘরে থাকে না।

বুড়ী আপন মনে সব বলে চলেছে, বনহুর কিংবা বিজয়া কোনো কথা বলার সুযোগ পায় না।

বুড়ী বলে চলে—ছেলে নেই, ঐ একটা মেয়ে, তাই কিছু বলি না, নাহলে কবে আমি ওকে খুন করে ফেলতাম। মেয়ে ছেলে একদণ্ড ঘরে থাকবে না, এটা কেমন কথা! এই দেখো না তোমাদের দু'জনাকে বসিয়ে রেখে কোথায় যে গেছে—আজ ফিরবে কিনা তাইবা কে জানে। আমি যদি না আসতাম তাহলে কি হতো বলো তো?

বনহুর বুড়ীর কথাগুলো শুনেই যাচ্ছিলো, কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

বিজয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলো। বুড়ীর কথা তার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করছিলো। বনহুর বুঝতে পারে বিজয়ার মনোভাব, তাই সে বলে—বুড়ীমা, বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেতে দাও না।

বুড়ী ব্যস্ত হয়ে পড়লো, কি বললে—খিদে পেয়েছে তোমার?

হাঁ বুড়ীমা, বড্ড খিদে....... বনহুর পেটে হাত বুলায়।

বুড়ী একটা ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে যায়।

বিজয়া হাঁফ ছেড়ে বললো—যাক্ বাঁচলাম! তুমি আমাকে বাঁচালে তিলক।

আমার কাছে বুড়ীকে বেশ ভালই লাগছে।

আমার কাছে অসহ্য।

বনহুর হেসে বলে—কেন?

জানা নেই শোনা নেই, তোমার-আমার সম্পর্কটা কেমন জড়িয়ে নিলো।

বলেছে, দোষ কি তাতে। যাক, কয়েক দিনের জন্য একটা আশ্রয় মিললো। বনহুর একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো। তারপর খেজুর পাতার চাটাইটার উপরে আরাম করে শুয়ে পড়লো সে, যেন সুকোমল বিছানায় শয়ন করেছে তেমনি সমস্ত শরীর ছড়িয়ে চীৎ হয়ে শুলো!

বিজয়া হেসে বললো—তিলক, তোমার ঘেন্না করছে না?

ঘেন্না, কি যে বলো বিজয়া! এত সুন্দর আরামের বিছানা পাবো তা ভাবতে পারিনি। তা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না? একপাশে শুয়ে বিশ্রাম করো, অনেক পথ হেঁটেছো।

বিজয়ার মুখ রাঙা হয়ে উঠে, কি করে তিলকের পাশে শোবে ভাবে সে।

বিজয়ার লজ্জারাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে বনহুর। ভাবে সে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের লজ্জা এত বেশী কেন? তার পাশে শোবে এতে দোষ কি? শুধু বিজয়ার বেলায় নয়, সে আরও বহুদিন বহু মেয়ের মধ্যে এটা লক্ষ্য করেছে। বহুদিন বহু মেয়ে তার সঙ্গে মিশবার জন্য, তাকে নিবিড় করে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে কিন্তু সে এগুলেই ও কুঁকড়ে গেছে কেঁচোর মত। জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। বনহুর তখন মনে মনে হেসেছে। বনহুর মেয়েদের নিয়ে যখনই ভেবেছে বিস্মিত হয়েছে; কারণ মেয়েরা যতই লজ্জাহীনা হোক তবু পুরুষদের কাছে তাদের বিরাট একটা দুর্বলতা রয়েছে।

মেয়েদের এই লজ্জাতুরা মধুময় ভাবটা বনহুরের কাছে বড় ভাল লাগতো, সে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দেখতো তখন তাকে।

বনহুর ভাবতো যে মেয়ের লজ্জা নেই সে মেয়ে মেয়েই নয়।

বিজয়া তখনও বসে আছে চুপচাপ।

বনহুর উঠে পড়লো—তুমি বিশ্রাম করো বিজয়া, আমি ততক্ষণ বাইরটা একবার ঘুরে আসি।

বিজয়া কিছু বলবার পূর্বেই বেরিয়ে যায় বনহুর।

বিজয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, সে খেজুর চাটাইটার উপরে শুয়ে পড়লো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

বনহুর বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে। চারিদিকে ঘন বন, মাঝে কোথাও একটু-আধটু ফাঁকা জায়গা আছে। কোথাও বা জলাশয়। বনহুর পা পা করে এগুতে লাগলো। মুক্ত হাওয়ায় বেশ ভালই লাগছে তার। ঘুরেফিরে বনটাকে দেখছে সে মনোযোগ সহকারে। বনটা ঘন হলেও বেশ পরিষ্কার; আগাছা বা ঝোপঝাড় তেমন নেই। শুধু নানা ধরনের বড় বড় গাছপালা প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর তাকালো উপরের দিকে—ঘন বনের ফাঁকে আকাশ তেমন দেখা যায় না, সামান্য একটু—আধটু নজরে পড়ে মাত্র।

বনহুর যখন ঘুরেফিরে দেখছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার ভেসে আসে তার কানে। বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর বলে মনে হয় তার। একদণ্ড বিলম্ব না করে বনহুর ছুটতে শুরু করে যেদিক থেকে আর্ত-চীৎকারটা এসেছিলো।

বন-বাদাড় ভেংগে ছুটে চললো বনহুর।

কিছুটা পথ এগুতেই বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো অদূরে একটা জলাশয়ের পাশে, মাটিতে পড়ে আছে সেই বৃদ্ধাটি আর একটি বিরাট ভল্লুক তাকে আক্রমণ করেছে। বৃদ্ধা অবিরত আর্তচীৎকার করে চলেছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ভল্লুকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বৃদ্ধাকে ছেড়ে দিয়ে ভল্লুকটি এবার আক্রমণ করলো বনহুরকে।

ভল্লুক আর বনহুরের মধ্যে শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ।

বৃদ্ধার শরীরের তেমন কোনো আঘাত লাগেনি, তাই সে উঠে পড়লো ধীরে ধীরে। তাকিয়ে দেখলো লোকটার সঙ্গে ভল্লুকটার ভীষণ লড়াই চলেছে। বৃদ্ধা হাঁপাচ্ছে রীতিমত আর খোদার নাম স্মরণ করছে। বৃদ্ধার আকুল কণ্ঠ কানে গেলো বনহুরের —হে ঈশ্বর, ওকে বাঁচাও, আমার প্রাণ রক্ষাকারীকে বাঁচাও..... হে ঈশ্বর.......

বনহুরের হাতে কোনো অস্ত্র না থাকায় ভল্লুকটিকে কাবু করতে তার বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো। দেহের নানা স্থানে আঁচড় লেগে রক্ত ঝরছিলো ঝরঝর করে। বনহুর প্রাণপণে ভল্লুকটার চোয়ালে মুষ্টিঘাত করে চলেছে।

ভীষণভাবে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভল্লুকটা কাবু হয়ে পড়লো। দু'হাতে চোয়াল ধরে চীরে ফেললো বনহুর জন্তুটাকে।

বৃদ্ধার দু'চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সে স্তব্ধ নিশ্বাসে দেখছিলো এই অদ্ভুত লড়াইটা। মানুষ আর জন্তুর এমন যুদ্ধ সে দেখেনি কোনোদিন।

বনহুর ভল্লুকটাকে ঘায়েল করে ফিরে এলো বৃদ্ধার পাশে, বললো—তোমার খুব লেগেছে বুঝি?

বৃদ্ধা বনহুরের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে নিজের ব্যথা ভুলে গিয়েছিলো, বললো—আহা বাছা, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার কি অবস্থা হলো বলো তো!

বনহুর হাতের পিঠে কপালের রক্তগুলো মুছে ফেলে বললো—তেমন লাগেনি বুড়ীমা।

সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। চলো বাছা ঘরে চলো, ঔষধ আছে লাগিয়ে দেবো। তারপর এগিয়ে গেলো মরা ভল্লুকটার দিকে। নিকটে গিয়ে ভল্লুকটার শরীরে পা দিয়ে বারবার লাথি মেরে গালাগালি করলো।

বৃদ্ধা এমনভাবে ভল্লুকটাকে গালি দিচ্ছিলো তাতে মনে হচ্ছিলো ভল্লুকটা যেন তার সব কথা শুনতে পাচ্ছে। এতে দুঃখেও হাসি পাচ্ছিলো বনহুরের।

বনহুরসহ বৃদ্ধা ফিরে এলো সেই কুটিরে যেখানে বিজয়া নিদ্রিত ছিলো।

বনহুর চলে যাবার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো বিজয়া। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ঘুমাতে পারেনি—হঠাৎ তার ঘুম ভেংগে গেলো, গা'টা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো। চারদিক নির্জন-নিস্পন্দ, ভয় হলো, কোনো জীবজন্তু এসে পড়বে কি না কে জানে। কুটিরের বাইরে এসে এদিক-ওদিক সে তাকিয়ে বনহুরের অন্বেষণ করছিলো, এমন সময় বৃদ্ধার সঙ্গে ফিরে এলো বনহুর।

বিজয়া বনহুরকে দেখামাত্র দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো এবং আর্তনাদ করে উঠলো— উঃ......

বনহুর আর বৃদ্ধা ততক্ষণে কুটিরের দাওয়ায় উঠে এলো।

বিজয়া হাত সরিয়ে তাকালো বনহুরের দিকে, ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তারপর কম্পিত-ভয়াতুর কণ্ঠে বললো—তিলক, তোমার এ অবস্থা কেন?

বনহুর কুটিরের দাওয়ার উপর বসে পড়ে হাত দিয়ে ক্ষত স্থানের রক্ত মুছে ফেলছিলো। সুন্দর মুখমণ্ডলে একটা বেদনাক্লিষ্ট ছাপ ফুটে উঠছিলো। বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠে বৃদ্ধা—আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ওর এ অবস্থা হয়েছে। ঈশ্বর ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো তাই আমি রক্ষা পেয়েছি।

বৃদ্ধার কথা শুনে বিজয়ার মনে কৌতুহল জেগেছিলো তবু সে তখন নীরব রইলো, কারণ প্রথমে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। পরে সব শুনলেই চলবে। বিজয়া বলে উঠলো—এখন কি করা যায় বলোতো বুড়ীমা? এখানে তো আর ডাক্তার নেই যে ঔষধ পাবো!

বিজয়ার কথা শুনে বললো বৃদ্ধা—মা, ঔষধের জন্যে ডাক্তার লাগবে না। আমার কাছে সব রকম ঔষধ আছে। আয় বাছা, ভিতরে আয়।

বিজয়া বনহুরের হাত ধরে বললো—চলো তিলক, ভিতরে চলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধা ঔষধ আনতে চলে গেলো বনের মধ্যে।

বিজয়া বনহুরকে খেজুর পাতার চাটাইটার উপরে শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশে বসলো। খানিকটা আঁচল ছিঁড়ে ফেললো সে, তারপর সেই কাপড় দিয়ে রক্ত মুছে দিতে লাগলো যত্ন সহকারে।

বিজয়া যখন মনপ্রাণ দিয়ে বনহুরের সেবা করে যাচ্ছিলো তখন সে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো—ভাবছিলো মেয়েদের দয়ামায়া এত বেশী! তারা শুধু দিয়েই যায়, প্রতিদান চায় না। আরও ভাবে কত কথা বনহুর।

বিজয়া তখন বনহুরের ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে দিয়ে পট্টি বেঁধে দিচ্ছিলো। বনহুর বললো—বিজয়া, তুমি রাজকন্যা হয়ে এত সেবা শিখলে কি করে?

বিজয়া একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—এসব মেয়েদের শেখাতে হয় না, সব ঈশ্বরের দান।

সত্যি বিজয়া। একটু হেসে বললো বনহুর-তোমরা মায়ের জাত, তোমাদের দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসাই পুরুষ জাতিকে জীবিত রেখেছে, নইলে তারা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তো।

বিজয়া এবার বনহুরের হাতে পট্টি বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিলো—পুরুষদের দানও কম নয় তিলক। তোমরা যদি মেয়েদের ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা সচ্ছ মনে গ্রহণ না করতে তাহলে তাদের জীবনটাও যে ব্যর্থতার হাহাকারে ভরে উঠতো।

বিজয়ার কথা শেষ হয় না, বৃদ্ধা কিছু গাছ-গাছড়ার রস নিয়ে হাজির হলো। রীতিমত হাঁপাচ্ছে বৃদ্ধা।

এবার সে বনহুরের পাশে বসে গাছের রসগুলো অতি যত্নে বনহুরের দেহের ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিতে লাগলো।

বিজয়া বুড়ীমাকে সাহায্য করে চললো।

❑

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে চম্পা দিদি? নূরী চারদিকে তাকিয়ে কথাটা বললো।

চম্পা হেসে বললো—নূরী, তোমার চম্পা দিদিকে বিশ্বাস করো, সে কোনোদিন তোমার মন্দ করবে না।

নূরী আবার বললো—তুমি না বলেছিলে শিকার করতে যাচ্ছো?

শিকার! শিকার করাই বটে। তোমার হুরকে তোমার নতুন করে শিকার করতে হবে, কারণ সে এখন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে।

চম্পার কথা শুনে অবাক না হয়ে পারে না নূরী। তার হুরকে নতুন করে শিকার করতে হবে....... সে তার কাছে থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে.... কেমন যেন এলোমেলো লাগে সব কথাগুলো।

চম্পা তখন ভাবছিলো অন্য কথা, নূরীর মুখে সে যা শুনেছিলো তাতে সে জানে নূরী আর বনহুর দু'জনা এক প্রাণ, এক মন, কিন্তু বনহুরের সঙ্গে

মেয়েটি কে? চম্পা দেখেছে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সেই তরুণীকে রক্ষা করেছে বনহুর। তরুণীর সঙ্গে বনহুরের কি সম্বন্ধ এটাই সে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তাই চম্পা নূরীকে সরিয়ে নিলো দূরে।

নূরীকে যে স্থানে আনা হয়েছে সে জায়গাটা বড় নির্জন, চারদিকে বন আর মাঝখানে প্রান্তর। প্রান্তরের মাঝে একটি বাংলা প্যাটার্নের বাড়ী। বাড়ীটা ইটের তৈরী নয়, সম্পূর্ণ পাথর কেটে এ বাড়ী তৈরী করা হয়েছে।

নূরীকে এই বাড়ীতে রাখা হলো।

চম্পা আর নূরী, আর দু'জন পাহারাদার ছিলো। তারাও ভীল যুবক।

এই পাহারাদারদ্বয় তীর-ধনু হাতে বাড়ীটার চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনো রকম হিংস্র জীবজন্তু যেন বাড়ীর আশেপাশে আসতে না পারে।

নূরী দেখলো বাড়ীটার মধ্যে দু'খানা ঘর। একটিতে নূরীকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে চম্পা, অপরটিতে থাকে সে নিজে।

ঘরগুলো সুন্দর পরিচ্ছন্ন, শ্বেত পাথরে তৈরী। উঁচু একটা জায়গায় সুন্দর শয্যা পাতা। একপাশে পাথরের তৈরী কাপড়-চোপড় রাখার আলনা। নানারকম অস্ত্রশস্ত্র সাজানো রয়েছে কক্ষের চারপাশে।

নূরী চম্পার আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে পড়েছে, তাকে সে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। চম্পার ব্যবহার তাকে কখনো হতবাক কখনো বাক-মুখর করে তুলেছে। চম্পা কখনো নূরীর সঙ্গে সখীর মত মিশেছে, কখনো বা বড় ভগ্নীর মত, কখনো আবার স্নেহময়ী জননীর মত। নূরী ভেবে পায় না চম্পা তাকে নিয়ে এমন খেলা খেলছে কেন? কি তার উদ্দেশ্য? হুর এসেছে কিন্তু কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছে? সত্যি না মিথ্যা? হয়তো বা হুরকে চম্পা খুঁজেই পায়নি। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বুঝি চম্পার এত ছলনা। তবে কি তার হুর জীবিত নেই? নূরীর মন অস্থির হয়ে উঠে।

সমস্ত রাত ঘুমাতে পারে না নূরী, বনহুরের কথা স্মরণ করে নীরবে রোদন করে সে। কখনও বা মনে পড়ে তার শিশু-সন্তান জাভেদের কথা, নাসরিনের কাছে সে কেমন আছে কে জানে!

রাত বেড়ে আসছে, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে নূরী। হঠাৎ তার কানে গেলো একটা অপরিচিত চাপা কণ্ঠস্বর; শুধু তাই নয়, আর একটি কণ্ঠস্বরও

শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে, সে স্বর তার অতি পরিচিত—এ যে চম্পার কণ্ঠস্বর! নূরী শয্যা ত্যাগ করে চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে আসে— বাইরে তখন জমাট অন্ধকার; সে অতি গোপনে এগিয়ে যায় যেদিক থেকে চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিলো সেদিকে।

কিছুটা এগুতেই তার কানে গেলো চম্পার ব্যস্তকণ্ঠ—ভীষণভাবে আহত হয়েছে?

হাঁ রাণীজী।

কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো মাইদি বুড়ী?

রাণীজী, আমার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে; আমি ঝুমুর নদীর দিকে যাচ্ছিলাম—সেখানে আমাদের নৌকা বাঁধা ছিলো, নৌকা থেকে কিছু ফলমূল আনতে যাচ্ছিলাম; ঠিক সেই সময় একটা বিরাট ভল্লুক আচমকা আমাকে আক্রমণ করে বসে। আমি কোনো উপায় না দেখে আর্তচীৎকার করে উঠি।

চম্পার কণ্ঠ—তারপর?

ভল্লুকটা আমার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার দেহে নখের আঁচড় দিয়ে চলেছে। আমি প্রাণরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম আর চিৎকার করছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম পরদেশী বাবু কোথা থেকে ছুটে এসে ভল্লুকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

চম্পার গলার আওয়াজ—কি বললি মাইদি বুড়ী, পরদেশী বাবু ঝুমুর নদীর কাছে গিয়েছিলো?

হাঁ, কি করে যে ওখানে পরদেশী বাবু হাজির হয়েছিলো জানি না। দেখলাম পরদেশী বাবু আর ভল্লুকটা ভীষণ লড়াই শুরু হয়েছে। পরদেশী বাবুর হাতে কোনো অস্ত্র ছিলো না, তবু সে লড়ে চলেছে।

আর তুই দাঁড়িয়ে দেখছিলি?

রাণীজী, আমার দেহের অনেক জায়গায় ভল্লুকটার নখের আঁচড়ে ক্ষত হয়েছিলো, তাই যন্ত্রণায় আমি কাঁদছিলাম।

চম্পার কণ্ঠ—নির্বোধ, তোমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না?

না রাণীজী, আমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না।

এ জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে মাইদি বুড়ী।

রাণীজী! অপরিচিত কণ্ঠস্বর কোনো বৃদ্ধার বলে মনে হচ্ছে নূরীর।

নূরী নীরবে কান পেতে শুনছিলো, বুকটা তার ধক্‌ধক্‌ করছে। পরদেশী বাবু কে, কি তার নাম কে জানে! মনোযোগ সহকারে শোনে নূরী।

চম্পার গলা—তারপর কি হলো বলো?

এবার অপরিচিত বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর—রাণীজী, বহু জোয়ান দেখেছি এমন লোক কোনোদিন দেখিনি। আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলাম, ভাবছিলাম ভল্লুকটার কবল থেকে পরদেশী বাবু আর রক্ষা পাবে না। কিন্তু আশ্চর্য, পরদেশী বাবুর কাছে অল্পক্ষণেই ভল্লুকটা কাবু হয়ে পড়লো। পরদেশী বাবু ভল্লুকটার চোখেমুখে চোয়ালে অবিশ্রান্ত ঘুষি মেরে চলেছে, একসময় নেতিয়ে পড়লো ভল্লুকটা। আমি তখনো ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে চলেছি।

ব্যস্ত কণ্ঠস্বর চম্পার—পরদেশী বাবুর কি হলো বলো?

আমি তো ভেবেছিলাম পরদেশী বাবু হয়তো বা ভীষণভাবে কাহিল হয়ে পড়েছে, সে বুঝি উঠতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য হলাম পরদেশী বাবু এতটুকু কাবু হয়নি, সে আমার সামনে এসে বললো, বুড়ী মা, তুমি কেমন আছো? খুব আঘাত লাগেনি তো? আমি তাকিয়ে দেখলাম পরদেশী বাবুর সমস্ত শরীর দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে।

পরদেশী বাবু তাহলে গুরুতরভাবে ঘায়েল হয়েছে? তাকে ঔষধ দাওনি?

ঘায়েল গুরুতরভাবেই হয়েছে কিন্তু পরদেশী বাবু কাহিল হয়নি। ঔষধ দিয়েছি। রাণীজী, আপনি কখন যাবেন?

যাবো। তুই এখন যা—দেখিস নূরী যেন জানতে না পারে। পরদেশী বাবুর অসুস্থতার কথা সে জানতে পারলে খুব কান্নাকাটা করবে। হাঁ, মেয়েটি তার সঙ্গে আছে তো?

আছে, মেয়েটি বাবুর সেবা-যত্ন করছে।

চম্পার কণ্ঠ-তাই নাকি?

হাঁ।

কান্নাকাটি করেনি সে?

করেছিলো। সব সময় বাবুর পাশে বসে তাকে দেখাশোনা করছে।

হুঁ। চম্পার গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ হলো।

বৃদ্ধার কণ্ঠ—আমি রাত্রেই চলে যাবো রাণীজী?

এবার চম্পার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ---যাবে না তো কি থাকবে! এক্ষুণি চলে যাও।

আর আপনি?

আমিও এই মুহূর্তে যাবো।

বৃদ্ধা চলে গেলা, তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো নূরী। নূরীর বুকটা থরথর করে কাঁপছে, সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার হুরের কথাই ওরা বলছে। তবে কি চম্পা তার হুরের কাছেই যাবে? বৃদ্ধা কে? কিই বা তার পরিচয়? চম্পা যে তার রাণীজী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে যা ভেবেছিলো তাই, চম্পা সাধারণ মেয়ে নয়। কিন্তু কে সে?

বেশীক্ষণ নূরী দাঁড়াতে পারলো না, অস্থির মন নিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো। সে নিজ কক্ষ থেকেই বুঝতে পারছে চম্পা তার কক্ষমধ্যে ড্রেস পরিবর্তন করে নিচ্ছে। নূরী সব টের পেলেও কিছু করতে পারছে না বা বলতে পারছে না। সে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিজকে সংযত করে রাখে। কিন্তু পরদেশী বাবু যদি তার হুর হয় তাহলে তার সঙ্গে মেয়েটি কে— যে মেয়েটি পরদেশী বাবুর সেবা-যত্ন করে চলেছে? নূরীর মনে নানা রকম আশঙ্কা দোলা দিতে থাকে। এতটুকু স্বস্তি সে পায় না, কি অমঙ্গল তার জন্য অপেক্ষা করছে কে জানে!

চম্পা যখন তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো তখন নূরী দরজার আড়াল থেকে সব দেখছিলো।

চম্পা যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তার শরীরে অদ্ভুত ড্রেস। বিস্ময়ে নূরী স্তম্ভিত হলো, এমন ড্রেস সে তো কোনোদিন দেখেনি। জমকালো ড্রেস ঠিক কতকটা পুরুষদের ড্রেসের মত।

অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো চম্পা।

নূরী নীরবে ফিরে এলো তার শয্যায়।

❑

চম্পার অশ্ব তীরবেগে ছুটে চলেছে।

অন্ধকারে পথ চিনতে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বন—প্রান্তর ছেড়ে একসময় নদীতীরে এসে পৌঁছলো চম্পা।

অদূরে নদীবক্ষে একখানা বড় নৌকা বাঁধা।

নদীতীরে চম্পার অশ্ব পৌঁছতেই কয়েকজন মাঝি নৌকা থেকে নেমে কুর্ণিশ জানালো।

চম্পা অশ্ব ত্যাগ করে নৌকায় চেপে পড়লো।

চম্পা অশ্ব থেকে নামতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক অশ্বটিকে ধরে ফেললো।

চম্পা নৌকায় দাঁড়িয়ে তীরস্থ লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা ফিরে যাও।

একজন বললো—কাল কখন আবার ঘোড়া নিয়ে হাজির হবো রাণীজী?

কাল দুপুর বেলা তোমরা এখানে আসবে।

আচ্ছা। কুর্ণিশ জানালো ওরা তীর থেকে।

চম্পা এবার নৌকা ছাড়বার আদেশ দিলো।

মাঝিরা সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো। নৌকা চলতে শুরু করলো।

চম্পা এবার নৌকার ছৈ-এর মধ্যে প্রবেশ করে তার আসনে বসলো। এ নৌকাখানা চম্পার নিজস্ব নৌকা। এতে সে ছাড়া আর কারো চাপার অনুমতি নেই। ভিতরে সুন্দর করে সাজানো চম্পার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। একপাশে সুন্দর করে শয্যা পাতা রয়েছে। এক পাশে আসন, কতকটা চেয়ারের মত। আসনটি হাতীর হাড়ে তৈরী। অতি মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নৌকার মধ্যে চম্পার নানা ধরনের পরিচ্ছদ সাজানো রয়েছে।

চম্পা আসনে বসতেই দু'জন তরুণী এসে দাঁড়ালো তার দু'পাশে। চম্পার দেহ থেকে সেই অদ্ভুত ড্রেস খুলে নিলো, তারপর তাকে সম্পূর্ণ ভীল তরুণী বেশে সজ্জিত করলো ওরা।

এই মুহূর্তে চম্পাকে একেবারে ভীলবালা বলেই মনে হচ্ছিলো।

এলোমেলো চুলগুলো বামপাশে ঝুটি করে বেঁধে দিলো ওরা। খোঁপায় একটা রক্তজবাও গুঁজে দিতে ভুললো না তারা। হাতে বালা, পায়েও মল পরিয়ে দিলো তরুণীদ্বয় যত্ন সহকারে।

নৌকা এপারে পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে এলো।

চম্পা যখন তার সেই কুটিরে পৌঁছলো তখন বেলা হয়েছে।

কুটিরে প্রবেশ করেই চম্পা বনহুরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—বাবু, তোর কি হয়েছে বাবু?

বৃদ্ধা বসেছিলো বনহুরের পাশে, সে খেঁকিয়ে উঠলো— শয়তানী, সেই যে কাল দুপুরে গিয়েছিলি আর আজ ফিরছিস্। কোথায় গিয়েছিলি বল্? আজ তোকে মেরে হাড় গুড়িয়ে দেবো। বৃদ্ধা একটা লাঠি হাতে তেড়ে এলো চম্পাকে মারতে।

বিজয়া পাশেই ছিলো, সে কিছু বলতে গেলো কিন্তু তার পূর্বেই বনহুর বৃদ্ধার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে বলে উঠে—থাক বুড়ীমা, ওকে মেরো না। ও বোধ হয় হাওয়া খেতে গিয়েছিলো।

ওর হাওয়া খাওয়া বের করে দেবো, কোথায় গিয়েছিলি বল্? বল্ শয়তানী.......

চম্পা কম্পিত ভীত কণ্ঠে বলে—আমার সখীর বাড়ী গিয়েছিলাম, সে আমাকে আসতে দেয়নি তাই.... কিন্তু পরদেশী বাবুর কি হয়েছে মা?

সে কথা পরে শুনবি, এখন কাজ কর। যা, পরদেশী বাবু আর পরদেশী বাবুর বৌ-এর জন্য খাবার নিয়ে আয়।

চম্পা বেরিয়ে যায়। যাবার সময় একবার করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে বনহুরকে।

অল্পক্ষণ পর চম্পা ফিরে আসে একগাদা ফলমূল নিয়ে। বনহুরের পাশে এসে বসে সে—বাবু, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

হাঁ চম্পা।

বাবু, আমার মা যে ঔষধ তোর শরীরে লাগিয়ে দিয়েছে সে ঔষধ খুব ভাল, তুই চট্‌পট্ সেরে উঠবি। এক ঝোপা আংগুর নিয়ে বনহুরের মুখে দিতে থাকে চম্পা—বাবু খা।

বনহুর চম্পার হাত থেকে আংগুর খেতে থাকে।

বিজয়াও তখন পাশে ছিলো, সে গম্ভীর হয়ে পড়ে। চম্পার আচরণে সে মোটেই খুশী নয় তা বেশ বুঝা যায়।

চম্পা নিজ হাতে বনহুরের মুখে আংগুর তুলে দিচ্ছিলো, তখন তার মুখমণ্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল লাগছিলো। পরদেশী বাবুকে সে নিজের হাতে খাওয়াতে পারবে এ কোনোদিন ভাবতে পারেনি।

বনহুর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে চম্পার মুখে তাকিয়ে কিছু লক্ষ্য করছিলো। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কি যেন খুঁজে ফিরছিলো চম্পার মুখে।

বিজয়ার মন অভিমানে ভরে উঠে। সে ভাবে একটা ভীল যুবতী এসে তার তিলককে দখল করে নিচ্ছে। ওর সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে তার?

ঠিক্ চম্পার মনেও ঐ সন্দেহ, বারবার চম্পা লক্ষ্য করছিলো বিজয়ার মুখ। বিজয়ার মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর লাগছিলো। চম্পা বনহুরের পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, ক্ষতস্থানগুলো সে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। চম্পার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন তার কত আপনজন!

বিজয়া তখন রাগে ফুলছিলো, বেরিয়ে গেলো সে কুটিরের মধ্য থেকে।

বনহুর বিজয়ার মনোভাব বুঝতে পেরে মৃদু হাসলো।

চম্পা বনহুরের কপালের ক্ষতটার পাশে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—বাবু, তোর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কেমন করে তোর এমন দশা হলো বাবু?

যদিও চম্পা পূর্বেই বৃদ্ধার মুখে সব শুনেছিলো তবু সে এই প্রশ্ন করলো।

বনহুর সব কথা বললো, আরও বললো সে—চম্পা, তোমার মাকে বাঁচাতে পেরেছি সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

বৃদ্ধা নিকটেই ছিলো সে নতুন ঔষধ তৈরী করছিলো। কোনো কারণে সে তখন বাইরে চলে গেলো।

চম্পা বললো—বাবু, সত্যি তুই বড় উপকার করেছিস্। তোকে আমি একটা জিনিস দেবো, নিবি বাবু?

বনহুর হেসে বললো— নেবো।

আজ না, দেবো একদিন।

কি দেবে তাতো বললে না চম্পা?

যেদিন দেবো সেইদিন দেখবি। তোর বড় পিয়ারা জিনিস বাবু।

আচ্ছা চম্পা, কাল আমাদের রেখে তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে বলো তে? সত্যি করে বলবে।

ঐ তো মায়ের কাছে বললাম তুই কি শুনতে পাস্নি বাবু?

পেয়েছি কিন্তু.......

হেসে উঠলো চম্পা খিল খিল করে, তারপর বললো—বিশ্বাস হয়নি, এই তো? আচ্ছা আমার সখীর ওখানে তোকে নিয়ে যাবো একদিন। যাবি তো বাবু?

ঠিক যাবো, আগে সেরি উঠি।

হাঁ বাবু, শীগগীর সেরে উঠবি তুই। আমার মা তোকে খুব ভাল ঔষধ দিয়েছে। বাবু, তুই সেরে উঠলে চলে যাবি না তো?

এমন সময় বিজয়া কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে বলে উঠে— সেরে উঠলেই আমরা চলে যাবো। এখানে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

চম্পা উঠে এলো এবার বিজয়ার পাশে, বললো—তুই চলে যাবি? পরদেশী বাবুকে নিয়ে চলে যাবি?

বিজয়া রাগতভাবে সরে গেলো চম্পার কাছ থেকে।

বনহুর মৃদু হাসলো।

কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো বনহুর। বৃদ্ধার ঔষধ বড় ভাল ছিলো, বেশীদিন ভুগতে হলো না তাকে। চম্পা প্রায়ই আসতো বনহুরকে দেখতে, আবার মাঝে মাঝে কোথায় চলে যেতো।

বিজয়ার মনে ঈর্ষা জাগলো, চম্পা যখন বনহুরের পাশে আসতো তখন সে মুখ ভার করে বসে থাকতো, বনহুরের কাছে সে সহজে আসতে চাইতো না।

চম্পা বলতো—বাবু, তুই বড় ভাল, তোর বৌ বড় রাগী, আমাকে দেখলে কেমন কট্‌মট্‌ করে তাকায়।

বনহুর হেসে বলে—চম্পা, তুমি এবং তোমার মা ভুল করছো, বিজয়া আমার বৌ নয়।

চম্পা গালে হাত রেখে অবাক হয়ে বলে—তাই নাকি, ঐ মেয়ে তোর বৌ না?

না।

তবে তোর সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ বাবু?

ও এক রাজার মেয়ে আর আমি একজন সাধারণ মানুষ।

বিস্মিত কণ্ঠে বলে চম্পা—ও রাজার মেয়ে?

হাঁ চম্পা।

কিন্তু তোর সঙ্গে কেন?

সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না চম্পা। আমি একজনকে হারিয়েছি, তাকেই খুঁজে ফিরছি। ও আমাকে ভালবাসে তাই আমার সঙ্গে এসেছে।

তুই যাকে খুঁজছিস তাকে পাস্‌নি বাবু?

না চম্পা। জানি না সে কোথায় আছে, কেমন আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস্ ত্যাগ করে বনহুর।

চম্পার বড্ড হাসি পায়, কারণ সে জানে যার জন্য পরদেশী বাবু আজ এমন উদ্ভ্রান্ত সে তারই কাছে রয়েছে। পরদেশী বাবুকে একটু নাকানি-চুবানি খাওয়ানোই তার উদ্দেশ্য।

হঠাৎ চম্পা হেসে উঠে খিল খিল করে।

বনহুর অবাক হয়ে বলে—হাসছো কেন চম্পা?

বাবু, তোর কষ্ট দেখে হাসছি।

কি বললে আমার কষ্ট?

হাঁ বাবু।

চম্পা!

বল্ বাবু?

আমার কষ্ট দেখে তোমার হাসি পায় বুঝি?

খুব হাসি পায়।

কেন?

আজ না বাবু, বলবো একদিন।

কবে সেদিন আসবে?

বাবু, একটা কথা আমি তোকে জিজ্ঞাসা করবো, জবাব দিবি বাবু?

বলো দেবো।

তুই যাকে খুজছিস তাকে পেলে চলে যাবি না তো?

বনহুর বিস্ময়ভরা নজরে তাকালো চম্পার মুখে।

চম্পা তখন ছুটে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে।

বনহুর পিছনে তাকিয়ে দেখে বুড়ীমা দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর তাকাতেই বলে উঠে—ও বড় শয়তানী মেয়ে, ওর কথা বিশ্বাস করিস না বাবু।

বৃদ্ধা আসতেই বনহুরের অন্যমনস্কতা কেটে গিয়েছিলো। বললো—বুড়ীমা, তোমার চম্পা বড় দুষ্টু মেয়ে।

হাঁ বাছা, ঠিক বলেছিস্।

এমন সময় বিজয়া এসে পড়লো সেখানে। চোখেমুখে তীব্র অভিমানের ছাপ বিদ্যমান। সে এতক্ষণ আড়াল থেকে চম্পা আর বনহুরের সব কথাবার্তা শুনছিলো।

বনহুর বিজয়ার মুখোভাব লক্ষ্য করে মৃদু হাসে। কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

বিজয়া বলে—তিলক, এবার ফিরে চলো, এখানে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

বৃদ্ধা বলে উঠলো—মা, তোর এখানে ভাল লাগবে না, এটা যে বন। চম্পা বড় শয়তানী, ও তোর সঙ্গে মিশতেই চায় না।

আসলে কিন্তু বৃদ্ধার কথা ঠিক উল্টো ছিলো। চম্পা বিজয়ার সঙ্গে মিশবার জন্য সব সময় চেষ্টা করতো, বিজয়াই মিশতে চাইতো না চম্পার সঙ্গে। চম্পা যখন তার কুটির আসতো তখন বিজয়ার মুখ গম্ভীর হয়ে পড়তো, চম্পার সঙ্গে সে কিছুতেই কথা বলতো না।

চম্পা অবশ্য বিজয়ার গায়ে পড়েই মিশতো।

অন্য আর একদিনের কথা।

বিজয়া বসে ছিলো একা একা।

হঠাৎ চম্পা পিছন থেকে ওর চোখে দুটো ধরে ফেলে চুপি চুপি।

চমকে উঠে বিজয়া, তিলক তো কোনোদিন তার সঙ্গে এভাবে আলাপ করে না—তবে কে? প্রকাশ্যে বললো—তিলক।

চম্পা হাত সরিয়ে নিয়ে হেসে উঠলো খিল খিল করে।

বিজয়ার মুখ গম্ভীর হয়ে পড়েছে, রাগতকণ্ঠে বললো—চম্পা, আর কোনোদিন আমার সঙ্গে এ ধরনের আলাপ করবে না। যাও এখান থেকে।

এমন সময় বনহুর সেখানে এসে পড়ে, সব শুনে বলে সে—ছিঃ বিজয়া অমনভাবে রাগ করতে নেই। তারপর চম্পাকে লক্ষ্য করে বলে—চম্পা, ওর কথায় কিছু মনে করো না। ওর হয়ে আমি তোমার কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

চম্পার মুখে এতটুকু রাগ বা অভিমান দেখা যায় না, সে পূর্বের মতই হাসিমুখে চলে যায় সেখান থেকে।

চম্পা চলে যেতেই বনহুর বলে—বিজয়া, ও তোমার মতই মানুষ। ওকে তুমি কেন ঘৃণা করো বলো তো?

বিজয়া কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর বলে আবার—তুমি রাজার মেয়ে আর চম্পা জংলী মেয়ে, এইতো পার্থক্য? ওর শরীরে যেমন রক্ত-মাংস রয়েছে, তোমার শরীরেও তেমনি রয়েছে। তোমার যেমন মনপ্রাণ আছে, ওরও আছে; তবে কেন তুমি ওর সঙ্গে সচ্ছমনে মিশতে পারো না বিজয়া। জানি তুমি ওকে সহ্য করতে পারছো না; কিন্তু ওকে তোমার সহ্য না করে উপায় নেই, কারণ আমরা এখন বিপদগ্রস্ত। উপায়হীন হয়েই আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। সুযোগ এলেই চলে যাবো।

বিজয়া বনহুরের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো, সে কোনো উত্তর দিলো না, সত্যি সে মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলো নিজের আচরণের জন্য।

বনহুর যখন কথাগুলো বলছিলো তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো চম্পা।

কথা শেষ হলে সে আস্তে সরে পড়ে সেখান থেকে। একটা দীপ্ত-উজ্জ্বল ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

❑

আজ তোমাকে বড় আনন্দ-মুখর লাগছে চম্পাদি? কি পেয়েছো যার জন্য এত খুশী তোমার? কথাগুলো বললো নূরী।

চম্পা গুন গুন করে গান গাইছিলো আর একটা আসনে বসে পা দোলাচ্ছিলো। নূরীর কথার জবাব না দিয়ে সে নূরীর চিবুক ধরে নাড়া দেয়।

নূরী বলে—তোমার খুশীর কারণ বলবে না আমাকে?

এবার কথা বলে চম্পা, বলে—আজ আমার পরাজিত জীবনের জয় হয়েছে নূরী। যাকে খুঁজে ফিরেছি এতদিন তাকে খুঁজে পেয়েছি। নূরী, আজ আমার বড় আনন্দ, বড় আনন্দ!

চম্পাদি, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আজ বুঝতে পারবি না, যেদিন বুঝবি সেদিন আমি হারিয়ে যাবো তোদের কাছ থেকে।

সেকি চম্পাদি, তুমি হারিয়ে যাবে!

চিরদিন কি তোরা আমাকে ধরে রাখতে পারবি?

সত্যি চম্পাদি, তোমাকে মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়, বুঝতে পারি না তুমি কেমন মেয়ে।

চম্পা কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য অন্য কথা তোলে, বলে সে—নূরী, আজ তোকে একটা গল্প বলবো, শুনবি?

নূরী গল্পের কথায় খুশী হয়ে উঠে, বলে—গল্প বলবে? শুনবো বলো?

তবে তৈরী হয়ে নে, গল্প বলবো এখানে নয়, নদীর বুকে আমার বজরায় বসে।

নূরীর আনন্দ আর ধরে না।

সে তখনই ছুটলো প্রস্তুত হবার জন্য।

চম্পা হাসলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নূরী তৈরী হয়ে ফিরে এলো।

চম্পা নূরীসহ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

কিছু সময়ের মধ্যেই তারা এসে পড়লো একটি নদীতীরে। চম্পা এদিকে আসেনি কোনোদিন। তাকিয়ে দেখলো নদীতীরে একটি বজরা বাঁধা।

বজরাখানা অতি সুন্দর করে সাজানো।

চম্পা বললো—আয় নূরী।

এগিয়ে চললো চম্পা।

নূরী তাকে অনুসরণ করলো।

বজরায় উঠে ওরা দু'জনা। অতি সুন্দর বজরাখানা। নূরী মুগ্ধ হলো বজরাখানা দেখে। এমন সুন্দর বজরা সে অনেকদিন দেখেনি।

বজরায় পৌঁছতেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। আকাশে ফুটে উঠলো অসংখ্য তারার মালা।

চম্পা আর নূরী বজরার ছাদে এসে বসলো।

পাশাপাশি বসলো ওরা।

নূরী তাকিয়ে দেখছে, অপূর্ব এক পরিবেশ চারিদিকে ছাড়িয়ে আছে। তারা যে শয্যায় বসে আছে সেটা অতি মূল্যবান মখমলের গালিচা। গালিটার উপরে কয়েকটা বালিশ ছড়ানো আছে। বালিশগুলোতে মখমলের

কভার। কয়েকটা ফুলদানী সাজানো রয়েছে, ফুলদানীগুলোতে অজানা কতকগুলো ফুল সাজানো রয়েছে। চম্পা আর নূরী আসন গ্রহণ করার পর দু'জন দাসী দু'খানা রেকাবীতে নানারকম ফলমূল এনে সাজিয়ে রাখে।

চম্পা ভীলকন্যা অথচ তার কথাবার্তা, চালচলন নূরীকে বিস্মিত হতবাক করে তোলে, সে ভেবে পায় না তার ভিতরের গভীর রহস্য কি—কে এই নারী? কিই বা এর আসল পরিচয়?

নূরীকে লক্ষ্য করে বলে চম্পা—খেয়ে নে, অনেকটা পথ এসেছিস্, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস্।

চম্পার কথা ফেলতে পারে না নূরী। সে রেকাবী থেকে ফল তুলে খেতে শুরু করে।

চম্পাও খেতে থাকে।

পূর্বদিক আলো করে তখন চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

নদীর বুকে রূপালী পানি কল্ কল্ করে ছুটে চলেছে। চাঁদের আলো যেন হাসছে।

চম্পা এবার বলতে শুরু করলো—হীন্দ জঙ্গল নামে এক জঙ্গল আছে, নীল নদের দক্ষিণে সে জঙ্গল। এই জঙ্গলে বাস করতো এক ডাকু, নাম তার হীন্দরাজ। যেমন ভয়ঙ্কর তার চেহারা তেমনি তার শক্তি। বিশ্বের কোনো দস্যু এই ডাকুর সঙ্গে পেরে উঠতো না। হীন্দরাজ নীলনদের তীরস্থ সমস্ত বনভূমির একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেছে। নীলনদ দিয়ে যে কোনো জাহাজ স্টিমার যেতো কোনোটাই তার কবল থেকে রক্ষা পেত না। জাহাজ বা স্টীমারের লোকজনকে সে হত্যা করতো, তারপর সমস্ত ধন-সম্পদ লুটে নিতো। এই দুর্দান্ত ডাকুর ভয়ে যে কোনো সওদাগর এই পথে যেতে কুণ্ঠা বোধ করতো। শুধু লোকহত্যা আর লুণ্ঠন নয়, যে কোনো নারীকে ধরে এনে তার ইজ্জত নষ্ট করতো সে এবং তার অনুচরগণ।

চম্পা গল্প বলে চলেছে।

নূরী বিস্ময়ভরা নয়ন মেলে তাকিয়ে আছে চম্পার মুখের দিকে। অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছে সে তার কথাগুলো।

বজরা ভেসে চলেছে, চারজন মাঝি বজরার বৈঠা মারছে। ফুরফুরে বাতাসে চম্পার এলায়িত চুলগুলো উড়ছে। নূরীর আঁচলখানা দোলা খাচ্ছে। চাঁদ এখন আরও উপরে উঠে এসেছে।

চম্পা বলে চলেছে—সেই দুর্দান্ত ডাকুর একটি দুটি নয়, অনুচর ছিলো একশোর বেশী। এক-একটি অনুচর ছিলো এক একটি জীবন্ত শয়তান।

যেমন চেহারা তেমনি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। ডাকু হীন্দরাজ মনে করতো তার চেয়ে বড় ডাকু এ পৃথিবীতে আর বুঝি দ্বিতীয় জন নেই। কিন্তু সে জানতো না তার চেয়েও বড় ডাকু আছে। একটু থামলো চম্পা।

নূরী একটু নড়ে বসলো।

ফুরফুরে বাতাসে নূরী বেশ আরাম বোধ করছিলো। চম্পার কণ্ঠে গল্পটা ভারী ভাল লাগছিলো তার। নিশ্চয় গল্পটা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ হবে। বলে নূরী—তারপর?

চম্পা বলে চলে—একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাত হলো আর একজন ডাকুর। তার নাম সিন্দরাজ। সিন্দ নামে এক জঙ্গল আছে, সে জঙ্গলের অধিপতি ছিলো সিন্দরাজ। সিন্দরাজ আর হীন্দরাজ উভয়ে জানলো উভয়ের কথা। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারলো না। দুই ডাকুর মধ্যে বাঁধলো ভীষণ যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়ী হলো সিন্দরাজ। বন্দী হলো হীন্দরাজ। হীন্দরাজ বন্দী হয়ে হিংস্র জন্তুর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। সিন্দরাজ হীন্দরাজকে বন্দী করার পর তার জেদ পূর্ণ হলো। সে হীন্দরাজকে মুক্তি দিলো বন্ধুত্ব মনোভাব নিয়ে। ফল হলো বিপরীত, সিন্দরাজের মন ছিলো কিছুটা ভাল উন্নত ধরনের, সে মনে করলো হীন্দরাজ এবার থেকে তার বশ্যতা মেনে চলবে।

তারপর?

কিন্তু হীন্দরাজ ছাড়া পেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। সে সদাসর্বদা সিন্দারাজকে কৌশলে বন্দী করে হত্যার চেষ্টা করতে লাগলো। হীন্দরাজের এই কৃতজ্ঞতাহীন আচরণের কথা তার একমাত্র কন্যা চন্দ্রার কানে গেলো। চন্দ্রা ডাকু হীন্দরাজের একমাত্র কন্যা। হীন্দরাজ কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করলেও চন্দ্রা তার পিতাকে ঘৃণা করতো।

নূরী বলে উঠে—কন্যা তার পিতাকে ঘৃণা করতো?

হাঁ, এবং চরমভাবে সে তার পিতাকে ঘৃণা করতো। শুধু তাই নয়, নিজের জীবনকে সে ধিক্কার দিতো কারণ তার পিতা মানুষ নামে কলঙ্ক ছিলো। চন্দ্রা বড় হবার পর থেকে তার পিতার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে শুরু করেছিলো। সর্বক্ষণ তাই সে পিতার পাশে পাশে থাকতো ছায়ার মত। হীন্দরাজ কিন্তু কন্যাকে অবিশ্বাস করতো না, সে মনে করতো তার কন্যা চন্দ্রা তার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সেই কারণে সে চন্দ্রাকে নিজের সব কাজে কাছে কাছে রাখতো। এমন কি তার কোনো গোপন কাজেও চন্দ্রা বাদ যেতো না।

চম্পার গল্প অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো নূরী। বড় অদ্ভুত লাগছিলো গল্পটা তার কাছে।

চম্পা মাঝে মাঝে ফল চিবুচ্ছিলো আর গল্পটা বলে যাচ্ছিলো। সে বলে বলেছে—চন্দ্রা পিতার গোপন আড্ডার গোপন পরামর্শ শুনতো এবং সে গোপনে পিতার কুকর্মের বাধা হয়ে দাঁড়াতো। তবে প্রকাশ্যে নয়, আত্মগোপন করে চন্দ্রা পিতার কাজে প্রতিবাদ করতো। কখনো কখনো সে পিতার সম্মুখে হাজির হতো, হীন্দরাজ কিন্তু কন্যাকে তখন চিনতে পারতো না।

নূরী বলে উঠে—সে কি রকম?

কারণ চন্দ্রা তখন স্বাভাবিক ড্রেসে থাকতো না। তার দেহে থাকতো জমকালো আলখেল্লা, যার নীচে ঢাকা থাকতো চন্দ্রার আসল রূপ।

থামলো চম্পা।

নূরীর মনে তখন জানার বিপুল উন্মাদনা। গল্পটার শেষ কি জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে, চম্পাকে থামতে দেখে বলে উঠে নূরী—তারপর কি হলো বলো চম্পাদি?

হাঁ বলছি, কিন্তু রাত ভোর হয়ে যাবে, ততক্ষণ জেগে থাকতে পারবি তো?

নূরী আগ্রহভরা কণ্ঠে বলে উঠে—পারবো।

বেশ আমি বলছি, শোন্।

বলো?

এমন সময় একটা মাঝি এসে রেকাবীতে কিছু আংগুর ফল রাখলো।

চম্পা বিরক্ত কণ্ঠে বললো—তোমাকে কে এখানে ফল আনতে বললো, বলো?

কেউ বলেনি, আমি নিজেই এসেছি, কারণ গল্প বলতে বলতে আপনার গলা শুকিয়ে গেছে কিনা......

মুহূর্তে চম্পার মুখ গম্ভীর হয়ে পড়লো, আজ পর্যন্ত কোনো অনুচর তার মুখের সামনে এমন করে কথা বলতে পারেনি, এ এমন করে কথা বললো কোন্ সাহসে! ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো চম্পা,—আর এখানে আসবে না।

মাঝি কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—আচ্ছা, আর আসবো না।

চম্পা আবার গল্প শুরু করে—চন্দ্রা পিতার সম্মুখে তার মন রেখে চলতো কিন্তু অন্তরালে সে তার পিতার বিপক্ষে কাজ করতো। পিতার কু'কর্মে সে কোনো সময় সহযোগিতা করতো না। সে বিক্ষিপ্ত উল্কার মত ছুটাছুটি করে বেড়াতো। দুর্দান্ত ডাকুর কন্যা হলেও তার ন্যায়নীতি ছিলো ধর্ম। পিতা এবং পিতার অনুচরদের কাউকে সে ভাল নজরে দেখতো না, যদিও তাকে তাদের সঙ্গে মিশতে হতো সদা-সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে। চন্দ্রার মন ছিলো সচ্ছ-নির্মল-পবিত্র, সে কোনো সময় কু'চিন্তা করতো না। সেই চন্দ্রাকে একদিন প্রেম নিবেদন জানালো তার পিতারই প্রধান সহচর শয়তানটি। অবশ্য সে অনেকদিন থেকেই চন্দ্রার পিছু লেগেছিলো, চন্দ্রা তাকে গ্রাহ্যই করতো না বা তার কোনো কথা কানে নিতো না। সেদিনের প্রেম নিবেদনও চন্দ্রা উড়িয়ে দিলো অবহেলা করে কিন্তু মনে মনে চন্দ্রা ভীষণ রেগে গেলো। মুখে কিছু না বললেও তার এই কথার প্রতিশোধ নেবার জন্য চন্দ্রা ক্ষেপে রইলো ভিতরে ভিতরে। দিন গড়িয়ে চলেছে, সিন্দারাজকে কাবু করতে চাইলেও তাকে হীন্দরাজ কাবু করতে পারলো না। একদিন সিন্দারাজ পরপারের ডাকে চলে গেলো। যেখানে এ পৃথিবীর কোনো কোলাহল গিয়ে পৌছিতে পারবে না। কেউ সূচ পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না আর তার। হিন্দরাজের প্রতিশোধ নেওয়া আর হলো না, সমস্ত প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেলো। হিন্দরাজ কিন্তু দমলো না, সিন্দরাজের উপরে যে রাগ ছিলো সেই রাগ গিয়ে পড়লো সিন্দরাজের পুত্র জয়রাজের উপর।

নূরী বলে উঠলো—সিন্দরাজের পুত্র জয়রাজ?

হাঁ, জয়রাজ সিন্দরাজের পুত্র। সে পিতার চেয়েও দুর্দান্ত শক্তিশালী দস্যু। হিন্দরাজের রাগ গিয়ে পড়লো জয়রাজের উপর। জয়রাজকে কাবু করতে পারলে তবে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে, মনের ঝাল মিটবে। হিন্দরাজ কি করে জয়রাজকে কাবু করতে পারবে, এই নিয়ে সে উন্মাদ হয়ে উঠলো। তার প্রধান অনুচর এ ব্যাপারে হিন্দরাজকে সদা-সর্বদা উৎসাহিত করে চলেছিলো। জয়রাজকে কি করে কাবু করা হয়, এ নিয়ে প্রায়ই হিন্দরাজের দরবারে গোপন বৈঠক বসতো। এ বৈঠকে সাধারণ অনুচর স্থান পেতো না। যারা হিন্দরাজের বিশ্বস্ত অনুচর এরাই এ বৈঠকে স্থান পেতো।

চন্দ্রা অবশ্য সর্বক্ষণ এ বৈঠকে পিতার পাশে থাকতো। জয়রাজ সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হতো তা শুনে তার মনে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব জেগে উঠতো। জয়রাজকে স্বচক্ষে দেখবার এবং তার সম্বন্ধে জানবার জন্য চন্দার মনে বিপুল আলোড়ন জাগতো। হিন্দরাজ আর তার অনুচরদের আলোচনার মধ্যে জয়রাজ সম্বন্ধে যত মন্দই বলা হোক তাকে, চন্দ্রার মনে এক নতুন উন্মাদনা জাগে। একদিন গোপনে সে বেরিয়ে পড়ে জয়রাজের সন্ধানে।

নূরী বলে উঠলো আবার—চন্দ্রা জয়রাজের দেখা পেয়েছিলো?

হাঁ, পেয়েছিলো কিন্তু বহু সাধনার পর। একটু থামলো চম্পা, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—যা সে কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি তেমনি এক অপূর্বরূপে দেখা পেয়েছিলো তার। চন্দ্রার সমস্ত হৃদয় অভূতপূর্ব এক অনুভূতিতে ভরে উঠেছিলো......

জয়রাজ চন্দ্রাকে দেখতে পায়নি? বললো নূরী।

চম্পা বললো—জয়রাজ চন্দ্রাকে দেখেছিলো কিন্তু ছায়া রূপে...

হঠাৎ চম্পার দৃষ্টি চলে যায় পিছনে, দেখতে পায় সেই মাঝি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—সেকি, তুমি দাঁড়িয়ে আছো এখনো?

মাঝি বলে উঠে—কই, আপনি তো আমাকে যেতে বলেননি, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

চম্পার মুখমণ্ডল রাগে রাঙা হয়ে উঠলো, তীব্র কণ্ঠে বললো—জানো তোমার কি শাস্তি হতে পারে?

জানি রাণীজী।

তবু......

আসতে বারণ করেছেন আর আসবো না।

যাও।

এবার যাচ্ছি।

চলে গেলো মাঝিটা।

চম্পা আবার বলতে শুরু করলো—চন্দ্রা জয়রাজকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসলো। শুধু তাই নয়, তার মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলো তাকে কিন্তু উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে দূরে বহু দূরে।

নূরী আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো—তারপর?

হিন্দরাজ যখন জয়রাজকে কৌশলে বন্দী করে হত্যার চেষ্টা চালাচ্ছো তখন চন্দ্রা গোপনে জয়রাজকে সাবধান করে দিতে লাগলো। তবু একদিন জয়রাজ বন্দী হলো, হিন্দরাজের বাসনা চরিতার্থ হলো, হিন্দরাজের প্রধান অনুচর জয়রাজের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করলো। তাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে তারই আয়োজন হলো।

জয়রাজকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করার আয়োজন করা হলো?

হাঁ, প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাধা অবস্থায় জয়রাজকে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মৃত্যু তার অনিবার্য, ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দ্রা জানতে পারলো জয়রাজকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হচ্ছে। চন্দ্রা ছদ্মবেশে ছুটে এলো সেইখানে, তীরবিদ্ধ করে হত্যা করলো হিন্দরাজের প্রধান অনুচর শয়তানটিকে। তারপর জয়রাজকে সে মুক্ত করে দিলো অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হতে।

জয়রাজ তাহলে বেঁচে গেলো চম্পাদি?

হাঁ, চন্দ্রা জীবিত থাকতে সে জয়রাজকে মরতে দিতে পারে না। তারপর থেকে চন্দ্রা জয়রাজের সঙ্গে ছায়ার মত থাকতো, সর্বক্ষণ অনুসরণ করতো সে তাকে।

জয়রাজকে মৃত্যুর কবল থেকে বহুবার চন্দ্রা বাঁচিয়ে নিলো তা হলে চম্পাদি?

হাঁ।

জয়রাজ কি জানতো চন্দ্রা তাকে ভালবাসে, তাকে রক্ষা করার জন্য সে সর্বক্ষণ তার পাশে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করছে?

জয়রাজ জানে না, আজও সে চন্দ্রাকে চিনতে পারেনি কে সে, কি তার আসল পরিচয়। হঠাৎ চমকে উঠে চম্পা, কে যেন ছায়ার মত সরে গেলো বজরার সিঁড়ির পাশ থেকে।

নূরী চম্পার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। সে বললো— চম্পাদি, তোমার গল্প শেষ হলো না তো?

হবে কিন্তু আজ নয়। দেখছো না আজ রাত ভোর হয়ে গেছে। চম্পা মাঝিদের আদেশ করে বজরা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

বজরার মাঝিগণ চম্পার আদেশ পালন করে।

❑

ভোরে ঘুম ভাংতেই বিজয়ার নজরে পড়ে অদূরে একটা খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে তিলক। ভোরের সূর্যের আলো কুটিরের বেড়ার ফাঁকে এসে পড়েছে তার মুখে। বিজয়া ভালভাবে লক্ষ্য করলো বুড়ীমা কোথায়। বুড়ীমার শয্যা খালি, বিজয়া বুঝতে পারলো সে তাদের প্রাতঃ ভোজের আয়োজনে বেরিয়েছে। বিজয়া নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তিলকের দিকে।

এমন সময় বুড়ীমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

বিজয়া চমকে ফিরে তাকায়।

বৃদ্ধা বলে উঠে—ঘুম ভেংগেছে বাছা?

হাঁ বুড়ীমা, কিন্তু ওর ঘুম ভাংগেনি।

বৃদ্ধা বলে উঠলো—ওকে ঘুমাতে দাও। চলো মা, তুমি বাইরে চলো, মুক্ত বাতাসে শরীর ভাল হবে।

বিজয়া শয্যা ত্যাগ করলো।

বৃদ্ধার সঙ্গে সে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ভোরের আলোতে বনভূমি ঝলমল করছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে বনভূমির মধ্যে। পাখীর কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে চারদিক। মুগ্ধনয়নে বিজয়া এসব লক্ষ্য করছিলো। রাজপ্রাসাদে কেটেছে তার আজীবন, এমন দৃশ্য সে দেখেনি কোনোদিন। অবাক হয়ে দেখছে সব।

বৃদ্ধ বললো—বাছা, এখানে তোমার কেমন লাগছে?

খুব ভাল লাগে বুড়ীমা কিন্তু বাবা-মার জন্য মনটা বড় অস্থির লাগছে।

হাঁ, তা লাগবেই তো। রাজার মেয়ে তুমি, আর এখানে এই কুটিরে থাকবে কি করে?

আমি রাজার মেয়ে এ কথা জানলে কি করে? কে তোমাকে একথা বলেছে বুড়ীমা?

কেউ বলেনি, তোমাকে দেখলে আপনা-আপনি বুঝা যায়।

তাই নাকি?

হাঁ বাছা।

বিজয়া একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ায়। বৃদ্ধাও তার পাশে পাশে এগিয়ে এলো।

বিজয়া বলে—বুড়ীমা, তুমি সব সময় আমার কাছে কাছে থাকো কেন বলো তো?

বিজয়ার কথায় হেসে বলে বৃদ্ধা—তোমাকে আমি আমার মেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসি, তাই সব সময় তোমার পাশে পাশে থাকি।

বিজয়া ভাবে, সত্যি বৃদ্ধা তাকে ভালবাসে এবং সেই কারণেই সে সদা-সর্বদা তার কাছে কাছে থাকে। তাকে ভাল ভাল ফলমূল খেতে দেয়। যখন বিজয়া ঘুমায় তখন পাশে থাকে সে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিজয়ার মনে কেমন যেন সন্দেহ জেগেছে, হঠাৎ বিজয়া দেখতে পেয়েছে বৃদ্ধা তার অলক্ষ্যে তার দিকে চুপি চুপি তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। এমনকি তিলকের সঙ্গে সে যখন নিভৃতে কোনো আলাপ-আলোচনা করছে তখন দূর থেকে বৃদ্ধা তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিজয়ার সৃঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বৃদ্ধা সরে গেছে সেখান থেকে।

বিজয়া সময় সময় বিরক্তি বোধ করতো, বৃদ্ধার আচরণে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো।

বনহুর বুঝতে পেরে বলতো—ওরা বনের মানুষ, তোমার মত সুন্দরী মেয়ে ওরা দেখেনি তাই অমন অবাক হয়ে দেখে।

বিজয়া বনহুরের কথা বিশ্বাস করে, ভাবে তাই হবে।

আজও বিজয়া বৃদ্ধার কথায় মনে মনে খুশী হয়, বলে বিজয়া—বুড়ীমা, চলো এবার ফিরে যাই।

চলো মা।

বুড়ীমা আর বিজয়া ফিরে আসে তাদের কুটিরে।

বিজয়া অবাক হয়—এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে তিলক!

বুড়ীমা ডাকলো—বাছা, এবার উঠো; বেলা যে অনেক হয়ে গেছে

গা মোড়া দিয়ে উঠে বসলো বনহুর।

হাই তুলে বললো—তাই তো, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখছি।

বুড়ী ওপাশ থেকে ফলমূলের ঝুড়ি নিয়ে ফল বাছতে বাছতে বললো—এবার মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও বাছা। মা-মনিও এতক্ষণ কিছু মুখে দেয়নি।

বনহুর বললো—বিজয়া, তুমি খাওনি কিছু?

বিজয়া বললো—তুমি ঘুমাবে আর আমি খাবো? তা হয় না তিলক।

কেন হয় না, আমি যদি সারা দিন ঘুমাতাম?

আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করতাম।

বৃদ্ধা এক ঝুড়ি ভাল ফল এনে বিজয়া আর বনহুরের সম্মুখে রেখে বেরিয়ে গেলো।

খেতে খেতে বললো বিজয়া—তিলক!

বলো?

এবার চলো আমরা ফিরে যাই।

বড্ড খারাপ লাগছে তোমার জানি। একটু থেমে বললো—আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো বিজয়া, আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।

তিলক, তুমি যাকে খুঁজে ফিরছো তার সন্ধান আর করবে না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—জানি না বিজয়া, তাকে আর পাবো কি না!

কথার ফাঁকে বনহুর আনমনা হয়ে যায়।

বিজয়া বনহুরের ভাবাপন্ন ভাব লক্ষ্য করে বলে—তিলক, কি ভাবছো?

ভাবছি তাকে আর পাবো কি না!

বিজয়া বললো—পাবে! আমার মন বলছে পাবে—কিন্তু......

বলো কিন্তু কি বিজয়া?

তিলক, যেদিন থেকে তুমি তোমার প্রিয়াকে পাবে সেদিন থেকে তুমি দূরে সরে যাবে। আমি হারিয়ে ফেলবো আমার জীবনসর্বস্ব......

বিজয়া, এসব কি বলছো তুমি?

তিলক, জীবন দিয়ে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম, তোমাকে পাবো না জেনেও আমি তোমাকে ভালবেসেছি। চিরদিন ভালবাসবো।

বনহুর বিজয়ার হাতখানা মুঠার মধ্যে টেনে নেয়, বলে—বিজয়া, তুমি রাজার মেয়ে হয়েও তোমার মধ্যে নেই এতটুকু অহঙ্কার। তুমি মহৎ হৃদয়া নারী, সেই কারণে আমিও তোমায় ভালবাসি।

বিজয়া আত্নহারা হয়ে যায়, সে কোনোদিন তিলকের মুখে এ কথা শোনেনি। আজ সে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়ে, তিলকের বুকে মাথা রেখে বলে—তিলক!

বিজয়া, তুমি তো জানো আমার জীবন স্বাভাবিক নয়। তাই চাই না আমার জীবনের সঙ্গে তোমাদের সুন্দর ফুলের মত জীবনকে জড়িয়ে বিনষ্ট করি।

বিজয়া বনহুরের প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে কিছু ভাবে, তারপরে সোজা হয়ে বসে বলে—তিলক, আমি জানি তোমার জীবনের মত সুন্দর জীবন আর নেই। তাই তুমি সবার কাছ থেকে দূরে থাকো। তিলক, তুমি তুলনাহীন......

বিজয়ার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কুটির মধ্যে প্রবেশ করে চম্পা। উচ্ছল ঝরনার মত এসে দাঁড়ায় সে বনহুর আর বিজয়ার সামনে। বলে উঠে চম্পা—পরদেশী বাবু, তুই ভাল আছিস্ তো?

বনহুর হেসে বলে—হাঁ, ভাল আছি। তুমি ভাল আছো তো চম্পা?

হাঁ বাবু।

এবার চম্পা বনহুরের হাত ধরে বলে—চল্ বাবু, বাইরে চল্। শিকার করতে যাবি বাবু?

বিজয়া ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো, বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠে সে—না,. ও যাবে না! তুমি চলে যাও চম্পা।

চম্পা বলে উঠে—বাবুকে তুই ধরে রাখতে পারবি না, বাবু যাবেই যাবে।

না, আমি ওকে যেতে দেবো না।

এমন সময় বুড়ীমা ভিতরে আসে, সে কিছুক্ষণ পূর্বে বাইরে কোনো কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলো। এসেই বলে বুড়ীমা—এসেছিস্ শয়তানী, আজ তোকে মেরে হাড় গুড়িয়ে দেবো।

বুড়ী একটা লাঠি হাতে এগিয়ে আসতেই বনহুর বাম হাতে তার লাঠিসহ হাতখানা ধরে ফেলে, তারপর বলে—থাক, ওকে মেরো না বুড়ীমা।

বৃদ্ধা খেঁকিয়ে উঠে—মারবো না, একশোবার মারবো। সারাটাদিন বেটি থাকে কোথায়? আমি বুড়ো মানুষ একা একা থাকি। কবে আমাকে বাঘ-

ভাল্লুক খেয়ে ফেলবে তখন শয়তানীকে দেখবে কে? আবোল-তাবোল বলে চলে বুড়ী।

বনহুর বলে—চলো বিজয়া, আমরা বাইরে যাই। ওরা মা-মেয়ে ঝগড়া করুক।

বিজয়া এবার খুশী হয়, বলে—তাই চলো।

বনহুর আর বিজয়া বেরিয়ে আসে বাইরে।

কুটিরমধ্যে তখন বৃদ্ধা ও তার কন্যা চম্পা মিলে ঝগড়া বেধে গেছে।

❑

বনহুর আর বিজয়া এগিয়ে চলেছে, চারদিকে তাদের লক্ষ্য রয়েছে। আজ নতুন তারা বনভূমি দর্শন না করলেও এ বনভূমি তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বিজয়া ভয় পাচ্ছিলো কখন কোন্ হিংস্র জন্তু এসে পড়বে।

বনহুরের মনে কিন্তু ভয়-ভীতি কিছু নেই, সে দীপ্তমুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিজয়া তার পাশে পাশে। এমন গহন বন বিজয়া এর পূর্বে দেখেনি, কেমন যেন বিস্ময় লাগছে তার কাছে। আজ বিজয়ার পাশে বনহুর না থাকলে সে কিছুতেই এক পা এগুতে সাহসী হতো না।

বিজয়া এগুতে এগুতে হঠাৎ চীৎকার করে উঠে, সে দেখতে পায় সামনে মস্তবড় একটা অজগর সাপ পড়ে আছে।

বনহুর সাপটাকে লক্ষ্য করে হেসে বলে—এই সাপটা দেখে এত ভয় পেয়েছো বিজয়া? দাঁড়াও আমি ওটাকে শেষ করে ফেলছি।

বিজয়া কিছু বলবার পূর্বেই বনহুর একটা গাছের মোটা ডাল ভেংগে নিয়ে সাপটাকে হত্যা করে ফেলে।

বিজয়ার দু'চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠে, মস্তবড় সাপটাকে এত সহজে সে কি করে হত্যা করলো! শুধু আজ নয়, বিজয়া বনহুরের আরও বহুদিনের বহু কাজে বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছে, আশ্চর্য হয়ে গেছে সে।

বিজয়া বনহুরকে যত দেখে তত অবাক হয়, ততই মুগ্ধ হয় সে। যেদিন বনহুর জংলীদের কবল থেকে বিজয়াকে উদ্ধার করে আনলো সেদিন বিজয়া কি বলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পায়নি। আজও বিজয়া ভাষা খুঁজে পায় না বনহুরকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবে।

সাপটাকে হত্যা করে বনহুর ফিরে এলো বিজয়ার পাশে, হেসে বলে—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?

বিজয়া ভুলে যায় সবকিছু, দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বনহুরের গলা—তিলক, তুমি বীর পুরুষ! অদ্ভুত মানুষ তুমি।

এমন সময় খিল খিল করে কে যেন হেসে উঠে তাদের পিছনে। চমকে ফিরে তাকায় বিজয়া আর বনহুর। দেখতে পায় তাদের পিছনে অদূরে দাঁড়িয়ে চম্পা। চম্পার হাসির শব্দই তারা শুনতে পেয়েছে।

বিজয়া চম্পাকে দেখামাত্র বনহুরের গলা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলো। বিজয়া চম্পাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে, কারণ সে ভাবতে পারেনি চম্পা তাদের অনুসরণ করে এখানেও চলে এসেছে।

বনহুরও কিছুটা অবাক হয় কিন্তু সে কিছু না বলে বাম হাতের পিঠে কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলতে থাকে।

চম্পা ততক্ষণে বিজয়া আর বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, দু'চোখে বিস্ময় টেনে বলে—বাবু, তুই খুব হিম্মৎওয়ালা। এত বড় সাপটাকে মেরে ফেলেছিস্। সেদিন মস্তবড় ভল্লুকটাকে মেরে আমার মাকে বাঁচিয়ে দিস্। তোকে আমি একটা ভাল জিনিস বখশিস দিবো।

বনহুর হেসে বললো—কই তোমার বখশিস? রোজ বলো কিন্তু দেবে কবে শুনি?

দেবো বাবু দেবো। আয়, তোদের একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাই। চম্পা বনহুরের হাত ধরে ফেলে।

বিজয়া চম্পার এ ব্যবহারে ভিতরে ভিতরে ভীষণ রেগে যায়, বনহুরের দিকে তাকিয়ে বলে—চলো ফিরে যাই!

বনহুর বলে উঠলো—চলো না দেখা যাক ও কোথায় নিয়ে যায়।

চম্পা বলে—হাঁ বাবু চল্।

বিজয়া বাধ্য হয় বনহুর আর চম্পাকে অনুসরণ করতে।

বিজয়া গম্ভীর মুখে অগ্রসর হচ্ছিলো।

চম্পা পথ চলছিলো আর মাঝে মাঝে খিলখিল করে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। বড় চঞ্চল মেয়ে চম্পা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ থেমে পড়ে চম্পা, সম্মুখে একটা ফলের গাছ দেখে এগিয়ে যায়। গাছটার উঁচু ডালে কতকগুলো ফল ঝুলছিলো। চম্পা লাফ দিয়ে ফল ছিঁড়তে

চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এবার চম্পা এগিয়ে আসে বনহুরের পাশে, আব্দারের সুরে বলে—বাবু, দু'টো ফল পেড়ে দে। দিবি বাবু?

বিজয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে—চলো তিলক, ও ফলে কাজ নেই, চলো......

চম্পা বলে আবার—বাবু, দুটো ফল পেড়ে দে বাবু।

বনহুর বিজয়াকে লক্ষ্য করে বললো—একটু অপেক্ষা করো বিজয়া, আমি ওকে দুটো ফল পেড়ে দিই। বিজয়া কিছু বলবার পূর্বেই বনহুর গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালো। অল্প চেষ্টায় সে কয়েকটা ফল পেড়ে আনলো। চম্পার হাতে ফলগুলো দিয়ে বললো—এবার খাও।

চম্পা একটা ফল খেতে শুরু করে, আর একটা ফল বিজয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলো—নে তুই খা।

বিজয়া মুখ ভার করেই ছিলো, বললো—আমি ও ফল খাই না।

বনহুর হাত বাড়িয়ে বললো—দাও, আমি খাবো।

চম্পা ফলটা বনহুরের হাতে দিলো।

বনহুর ফলটাতে কামড় দিয়ে বললো—বাঃ চমৎকার তো। বিজয়া একটা খেয়ে দেখো। বনহুর চম্পার হাত থেকে আর একটা ফল নিয়ে বিজয়ার মুখের কাছে ধরে বলে—নাও, খেয়ে দেখো বিজয়া।

আমি খাবো না।

তাহলে আমিও খাবো না। বনহুর নিজের অর্ধভক্ষণ করা ফলটা ছুড়ে ফেলে দিতে যায়।

এবার বিজয়া বলে উঠে—দাও খাচ্ছি।

বনহুর ফলটা বিজয়ার হাতে দেয়।

আবার এগুতে থাকে ওরা।

চম্পা বনহুরের দক্ষিণ পাশে, বাঁমপাশে এগুচ্ছে বিজয়া। বনপথে চলতে গিয়ে বিজয়ার বড্ড কষ্ট হচ্ছিলো।

বনহুর মাঝে মাঝে বিজয়ার হাত ধরে তাকে সহায়তা করছিলো।

ঘন বনের ফাঁকে কোথাও কোথাও সূর্যের আলো ছড়িয়ে আছে। তাই চারদিক তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো। আজ চম্পাকে বড় আনন্দমুখর লাগছিলো, সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলো। চম্পার পায়ের মলের ঝুমঝুম শব্দ আর শুকনো পাতার মড়মড় আওয়াজ মিলে এক মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলছিলো।

আজ বনহুরকেও বড় আনন্দমুখর দেখাচ্ছে। তার মুখে নেই কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ।

শুধু বিজয়াকে গম্ভীর লাগছিলো।

এত পথ বিজয়া হাঁটেনি কোনোদিন, সে অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো।

বনহুর বললো—চম্পা, তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছো বলো তো?

চম্পা হেসে বলে—বাবু, ভয় নেই: আমি তোদের কোনো খারাপ জায়গায় নিয়ে যাবো না।

বিজয়া বলে উঠে—আমি যাবো না, তুমি যাও তিলক।

বনহুর বললো—তা হয় না বিজয়া, তোমাকে এখানে একা রেখে আমি যেতে পারি না।

চম্পা বলে—আর বেশীদূর তোমাদের যেতে হবে না বাবু। ঐ যে বনের মধ্যে একটা কুটির দেখতে পাচ্ছিস ওখানে যাবো।

বনহুর আর বিজয়া তাকিয়ে দেখলো সত্যিই বনের ফাঁকে দূরে অনেক দূরে একটা কুটির দেখা যাচ্ছে।

বনহুরের মনেই শুধু নয়, বিজয়ার মনেও বিস্ময় জাগে। চম্পা তাদের এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ও কুটিরখানাই বা কার?

একটা বিপুল আগ্রহ নিয়ে চলে বনহুর চম্পার সঙ্গে। ঐ কুটিরের মধ্যে কি বা কে আছে দেখতে চায় সে। বিজয়া বিরক্ত হলেও সে কোনো কথা না বলে বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে চলে।

চম্পা বলে—বাবু, জঙ্গলে তোদের খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

না চম্পা, কোনো কষ্ট হচ্ছে না, তবে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। বিজয়াকে লক্ষ্য করে কথাটা বললো বনহুর।

এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে তারা একসময় সেই কুটির খানার নিকটে এসে পড়লো।

চম্পা কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো, বললো—বাবু, তোরা এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুণি আসছি।

চম্পা চলে গেল কুটিরের মধ্যে।

বিজয়া আর বনহুর দাঁড়িয়ে রইলো কুটিরটার সম্মুখে।

চম্পা কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা ঘোমটা ঢাকা মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, ওর কানে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো—সে এসেছে, কিন্তু সাবধান! এসো আমার সঙ্গে।

ঘোমটা ঢাকা মেয়েটি এগিয়ে বললো চম্পার পিছু পিছু, অতি সন্তর্পণে ধীর পদক্ষেপে চম্পার পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর আর বিজয়া অবাক হয়ে তাকালো চম্পার পাশে ঘোমটা ঢাকা মেয়েটির দিকে।

চম্পা বলে উঠলো—বাবু, এই আমার সখী যার কাছে রোজ আমি আসি। এর নাম কি জানিস্ বাবু? আমি তোকে এর নাম বলছি—এর নাম হলো হীরা। বাবু, আমার সখী খুব ভাল মেয়ে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মেয়েটির পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করে, তারপর হঠাৎ হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ......

চম্পা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ভরা নয়নে। বনহুর যখন হাসছিলো তখন তার মধ্যে চম্পা নতুন একরূপ দেখতে পায়, অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো তখন তাকে।

চম্পার বান্ধবী ততক্ষণে ছুটে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে।

বনহুর হাসি বন্ধ করে বলে উঠে—চম্পা, তোমার সখী বড্ড লজ্জা পেয়ে গেছে!

হাঁ বাবু, ও বড় লাজুক মেয়ে, ভাবলাম তোদের সাথে ওর মিলজিল করে দেবো কিন্তু........

বনহুর হেসে বললো—থাক আর মিলজিলে কাজ নেই।

বিজয়া মুখ ভার করে বললো—এইজন্য এতটা পথ আমাদের কষ্ট করে নিয়ে এলে চম্পা, তোমার যদি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকতো......

বনহুর বলে—তাতে কি আছে, বনটাতো ঘুরে দেখা হলো।

বিজয়া রাগত কণ্ঠে বললো—তিলক, এতদিন বনে বনে কাটিয়ে তবু তোমার বন দেখার সখ মিটলো না। চলো এবার ফেরা যাক।

বিজয়ার কথায় বনহুর রাজী হলো, বললো—তাই চলো।

চম্পা পথ আগলে দাঁড়ালো—বাবু, তোরা এসে এমনি করে চলে গেলে আমার সখী খুব রাগ করবে। বাবু, তুই এখানে বস্। তারপর বিজয়াকে লক্ষ্য করে বললো—আয় বোন, তুই ভিতরে আয়।

বনহুর বসে পড়লো দাওয়ায় মাটির মধ্যে।

বিজয়া চম্পার সঙ্গে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

কুটিরে প্রবেশ করেই বিজয়ার দৃষ্টি পড়লো সেই মেয়েটির মুখে, একটু পূর্বে যে মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিলো সেই মুখ এখন উন্মুক্ত।

বিজয়া বিস্ময়ভরা নয়নে দেখলো অপূর্ব সুন্দর সে মুখ। স্তব্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো বিজয়া সেই মুখের দিকে।

চম্পা কিছু ফল নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সুন্দরী তরুণীটিও বিজয়ার দিতে তাকিয়ে আছে নির্বাক দৃষ্টি মেলে

চম্পা বনহুরকে ফল খেতে দিয়ে বললো—তুই খা বাবু।

বনহুর খুশী হয়ে ফল খেতে শুরু করলো।

চম্পা চলে যাচ্ছিলো, বনহুর বললো—চম্পা শোনো।

চম্পা দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—চম্পা, তোমার বান্ধবীকে আমার শুভেচ্ছা বলো।

আচ্ছা বাবুজী।

চম্পা চলে যায়।

কিছু পরে বিজয়া সহ চম্পা ফিরে আসে।

এবার বিজয়া আর বনহুর চম্পার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

চলতে চলতে বলে বনহুর—কুটিরের মধ্যে কি দেখলে বিজয়া?

বিজয়া বলে—অদ্ভুত এক নারীমুখ দেখলাম তিলক।

থমকে দাঁড়িয়ে পরে বলে বনহুর—অদ্ভুত এক নারীমুখ—তার মানে?

যে মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিলো আমি সেই মুখ দেখেছি তিলক। সত্যি বলছি, এমন সুন্দর মুখ আমি এর পূর্বে আর দেখিনি। অপূর্ব সুন্দরী......

চম্পার বান্ধবী?

কিন্তু আশ্চর্য, চম্পা যেমন চঞ্চল উচ্ছল, ওর বান্ধবী ঠিক তার উল্টো।

তুমি সত্যি কথা বলছো তিলক। মেয়েটি সুন্দরী বটে কিন্তু বোবা।

বোবা?

হাঁ, কারণ সে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

ও সেই কারণেই বুঝি আমাদের সামনে অমন করে মুখে ঘোমটা টেনেছিলো।

বিজয়া আর বনহুর কথাবার্তা বলতে বলতে এগিয়ে চললো।

❑

নূরী, সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার অসীম ধৈর্যবল দেখে। প্রিয়কে সম্মুখে পেয়েও তুমি নিজকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছো। কথাগুলো বলে থামলো চম্পা।

নূরীর মুখেচোখে উচ্ছল আনন্দ, আজ সে তার জীবনসর্বস্ব প্রিয় হুরের সাক্ষাত লাভ করেছে। কথা দিয়েছিলো চম্পার কাছে, সে বনহুরের সম্মুখে যাবে অথচ তার সামনে সে নিজকে কঠিনভাবে সংযত রাখবে। সে পরীক্ষায় জয়ী হয়েছে কিন্তু একটা ব্যথা নূরীর মনে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে তা হলো বনহুরের সঙ্গের মেয়েটা। কে সে মেয়েটি? বনহুরের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ? এত আনন্দের মধ্যেও নূরীর হৃদয়ে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছিলো, সে যেন শান্তি পাচ্ছিলো না মনে।

নূরীর মনের কথা বুঝতে পারে চম্পা। মৃদু মৃদু হাসে সে।

বজরাখানা তখন ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে।

চম্পা নূরীর চিবুকে একটুখানি নাড়া দিয়ে বলে—নূরী, তুই কিচ্ছু ভাবিস্নে, তোর স্বামীর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তার মত পুরুষ আর হয় না। যে মেয়েটিকে ওর সঙ্গে দেখলি সে এক রাজার মেয়ে। ভালবেসেছিলো ওকে কিন্তু পারেনি ওকে জয় করতে। নূরী, তোর মত ভাগ্যবতী মেয়ে......

❑

হঠাৎ চম্পা চমকে উঠে কখন যে সেই মাঝি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে তারা কেউ টের পায়নি। চম্পা মাঝখানে কথা বন্ধ করে ফেলায় নূরীও ফিরে তাকায়, মাঝিটিকে লক্ষ্য করে সেও বিস্মিত হয়। আরও অনেক দিন সে লক্ষ্য করেছে এই মাঝিটি প্রায়ই তাদের কথাবার্তা চলার সময় আশেপাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন যেন সন্দেহ জাগে নূরীর মনে।

চম্পা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—হরিনাথ, তোমাকে বার বার বলেছি এখানে আসবে না।

হরিনাথ হাত কচলায়—রাণীজী এবারের মত মাফ করে দেন, আর আমি আসবো না।

চম্পা রাগত কণ্ঠে বলে উঠলো—মাফ! এবার মাফ করবো না। হাতে তালি দিলো চম্পা, সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বলিষ্ঠ লোক এসে দাঁড়ালো।

চম্পা আদেশ দিলো—একে নিয়ে যাও—বন্দী করে রাখো, পরে বিচার করবো।

সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ লোকগুলো মাঝি হরিনাথকে ধরে ফেললো।

চম্পা বললো—নিয়ে যাও।

হরিনাথ মাঝিকে নিয়ে চলে গেলো ওরা।

চম্পা আর নূরী আবার গল্প শুরু করলো।

লোক তিনজন হরিনাথকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো, যেমনি তাকে বজরার পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অমনি হরিনাথ প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে নিজকে ছাড়িয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে বজরার বিপদ সংকেত শব্দ ধ্বনি হতে শুরু হলো।

চম্পা ছুটে গেলো সেই দিকে যেদিক থেকে সংকেত ধ্বনি আসছিলো।

নূরীও চম্পার পিছনে এগিয়ে চললো।

সেই বলিষ্ঠ লোক তিনটির নিকট পৌঁছে চম্পা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। চম্পা কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো—কি করে পালালো?

বলিষ্ঠ লোকগুলোর একজন—রাণীজী, হরিনাথ আমাদের কাবু করে পালিয়েছে। ঐ যে নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—এমন বলিষ্ঠ জোয়ান তিনজন লোককে কাবু করে পালাতে পারলো আশ্চর্য বটে।

ততক্ষণে একজন লোক তীর ধনু উঁচু করে ধরলো—রাণীজী বলো খতম করে দেই?

চম্পা বাধা দিয়ে বললো—থামো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তীর-ধনু নীচু করে নিলো কিন্তু মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে পড়লো। চম্পা হঠাৎ তার কাজে বাধা দিলো কেন ভেবে পেলো না।

নূরীও অবাক হলো।

চম্পার গোটা মুখে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে। ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছু ভাবতে লাগলো সে।

নূরী চম্পার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো চম্পার মুখোভাব। নূরীর মনে চম্পাকে নিয়ে বড় সন্দেহ, ওকে যত সে দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। চম্পা ভীল যুবতী, তাকে দেখলে ভীল যুবতীই বলে মনে হয় কিন্তু তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার অতি বিস্ময়কর। নূরী যতক্ষণ চম্পার পাশে থাকে ততক্ষণ তাকে দেখে আর ভাবে কত কথা।

বজরা ফেরাবার আদেশ দেয় চম্পা।

এবার চম্পা আর নূরী বজরার ছাদে এসে বসে।

চম্পাকে ভাবাপন্ন দেখে বলে নূরী—চম্পাদি, হঠাৎ কি হলো তোমার বলো তো?

কিছু না।

হঠাৎ তোমাকে বড্ড গম্ভীর লাগছে কেন চম্পাদি?

জানি না বোন, কি যেন হলো।

সত্যি তুমি আশ্চর্য মেয়ে!

হাঁ, সে কথা সত্যি।

তুমি সাধারণ মেয়ে নও তাও সত্য।

নূরী!

হাঁ চম্পাদি। দেখো আমার কাছে তুমি নিজের পরিচয় যতই গোপন রাখো, আমি জানি তুমি ভীলকন্যা নও। আজ তোমাকে বলতে হবে কি তোমার পরিচয়, কে তুমি......

আজ নয় বোন, একদিন তোর কাছে আমার পরিচয় সচ্ছ হয়ে যাবে।

নূরী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে—সেদিন যে গল্প বললে কই তা তো শেষ করলে না চম্পাদি।

শেষ........

হাঁ, শেষ আমি শুনতে চাই।

যেদিন আমার পরিচয় পাবে সেদিন আমার গল্পের শেষও জানতে পারবে।

আর কতদিন প্রতীক্ষা করতে হবে চম্পাদি?

বেশী দিন নয়।

চম্পাসহ নূরী ফিরে আসে তাদের নদীপারের বাড়ীখানায়।

যে যার কক্ষে শয়ন করতে চলে যায়।

❑

চম্পা নিজের ঘরে প্রবেশ করে হঠাৎ হেসে উঠে খিলখিল করে। অদ্ভুত সে হাসির শব্দ। পাশের পক্ষে নূরীর কানে গিয়ে পৌছায়। নূরী শয্যায় শুয়ে ভাবতে থাকে অবাক হয়ে।

কখন যে নূরী ঘুমিয়ে পড়ে খেলায় নেই।

হঠাৎ কারো নিশ্বাসের শব্দে ঘুম ভেংগে যায় নূরীর। চোখ মেলে তাকায়, কক্ষ অন্ধকার। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে নূরী এ নিশ্বাসের শব্দ কার। কোনো পুরুষের নিশ্বাসের শব্দ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শিউরে উঠে নূরী, তবে কি কেউ তার ঘরে প্রবেশ করেছে?

বুকটা ঢিপ ঢিপ্ করছে নূরীর। নিশ্বাসের শব্দ অতি নিকটে, ঠিক তার বিছানার পাশে মনে হচ্ছে।

স্তব্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে নূরী একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য। এবার নিশ্বাসের শব্দ ঠিক তার বিছানায় ঝুঁকে এলো। সে কি জেগে না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে ঠিক বুঝতে পারছে না। হাত-পা যেন কেমন অবশ মনে হচ্ছে। চোখ দুটো ভয়ে বন্ধ হয়ে আসছে আপনা আপনি।

এমন সময় কেউ যেন তার কানের কাছে ঝুঁকে এলো বলে মনে হলো নূরীর।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে দরজা খোলার শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে তার কক্ষমধ্য হতে কেউ দ্রুত উন্মুক্ত জানালাপথে বেরিয়ে গেলো বুঝতে পারলো নূরী।

চম্পা প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

নূরীর এতক্ষণে সাহস হলো, সে শয্যা ত্যাগ করে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো চম্পাকে—চম্পাদি......

চম্পা নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—কি হয়েছে নূরী, বলো?

কে যেন আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলো।

হাঁ, আমারও সেইরকম সন্দেহ হয়েছিলো।

চম্পাদি, আমাকে তুমি একা এ ঘরে রেখো না। কোনো শয়তান লোক আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলো। ভাগ্যিস, তুমি এসেছিলো তাই রক্ষা...

চম্পা নূরীর ভয়াতুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, বলে—এই সাহস নিয়ে তুমি দস্যু বনহুরের জীবন-সঙ্গিনী হয়েছো? বেশ, আজ থেকে তুমি আমার ঘরে আমার কাছে শোবে।

❑

চম্পাকে আজ আরও গম্ভীর ভাবাপন্ন বলে মনে হচ্ছে।

নূরী ভেবে পায় না চম্পার কি হয়েছে।

নূরী একসময় বলে বসে—চম্পাদি', বলতে পারো কাল রাতে কে আমার ঘরে এসেছিলো?

চম্পার মুখখানা কেমন যেন ভাবপূর্ণ হয়ে উঠলো, একটু হেসে বললো—পারি।

তবে কেন তাকে এতক্ষণ পাকড়াও করে এনে শাস্তি দিচ্ছো না?

তাকে পাকড়াও করবো বলেই তো আমার এত প্রচেষ্টা কিন্তু পারছি কই! একটু থেমে বললো চম্পা—ঐ হরিনাথ মাঝি তোমার ঘরে প্রবেশ করেছিলো।

যে কাল মাঝনদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়েছিলো।

হাঁ। বললো চম্পা।

মুহূর্তে নূরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো, একটা ভীতি ভাব ছড়িয়ে পড়লো তার সারা অন্তরে। নূরীর মনে পড়লো আরো অনেক দিনের কথা। লোকটা প্রায়ই তার দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করেছে। যখনই একা তাকে দেখেছে তখনই একটা ভয়াতুর ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে সেখান থেকে। লোকটাকে প্রথম থেকেই নূরীর সন্দেহ হয়েছে।

নূরী বলে উঠলো—চম্পাদি, তুমি ওকে মারতে দিলে না কেন? লোকটাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করাই উচিত ছিলো।

চম্পা শুধু হাসলো।

❑

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে শুয়ে শুয়ে ভাবছে বনহুর সেই নারীর কথা, যে নারীর কাছে সে সর্বতোভাবে ঋণী। তাকে বহুবার এই নারী শত্রুর কবল থেকে কৌশলে উদ্ধার করে নিয়েছে। বহুবার বহু বিপদ থেকে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু কে সে? আজও সেই নারী তার কাছে নিজকে গোপন রেখেছে। কিন্তু কেন? কেন সে তার কাছে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকে—আর কেনই বা তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কি লাভ তার এতে!

শুধু আজ নয়, অবসর মুহূর্তে প্রায়ই তার মনে সেই অজানা নারীমূর্তির প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। অনেক চেষ্টা করেও সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না সেই ছবি।

চির উচ্ছৃঙ্খল বনহুর তখন কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে। গভীরভাবে তলিয়ে ভাবতে চায় মেয়েটির কথা। কিন্তু বেশীক্ষণ কিছু ভাববার সময় থাকে না বনহুরের। নানা চিন্তা উঁকি দেয় তার মনে।

আজও বনহুর তাই শুয়ে ভাবছিলো সেই নারীটির কথা, কে এই নারী যার নাম আশা। যে আশা তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করে চলেছে......

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চম্পা কখন তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে; ডাক দেয় সে—বাবু?

বনহুর চোখ তুলে তাকায়, বিস্মিত দৃষ্টিতে চম্পার মুখে তাকিয়ে বলে—চম্পা!

হাঁ বাবু।

বসো।

চম্পা আজ বিনা দ্বিধায় বসে পড়ে বনহুরের পাশে। বলে চম্পা—বাবু, ও কোথা গেছে?

কার কথা বলছো, বিজয়ার কথা?

হাঁ।

বুড়ীমার সঙ্গে বাইরে গেছে।

তুই একা একা শুয়ে আছিস্ বাবু?

একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—হাঁ, বড্ড একা। তুমি এসেছো ভালই হলো, একটা গল্প বলো চম্পা?

গল্প?

হাঁ।

আমি কি গল্প জানি বাবু?

তবু, যা জানো বলো।

বাবু, তোর বৌ বড্ড রাগী মেয়ে?

কে আমার বৌ চম্পা?

ঐ যে বিজয়া?

না, ও আমার বৌ নয়।

তাহলে তোর সাথে থাকে কেন?

চম্পার এ প্রশ্নের জবাব চট্ করে দিতে পারে না বনহুর, একটু হেসে বলে—একদিন ওকেই একথা জিজ্ঞাসা করো চম্পা।

চম্পা বলে উঠে—আমি বাবু সব জানি। ও তোকে বহুৎ পিয়ার করে। আচ্ছা বাবু, তুই ওকে পিয়ার করিস্ না?

এবার বনহুর হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—পিয়ার! চম্পা, আমি কাউকে পিয়ার করি না।

কেন বাবু? তুই এত নিষ্ঠুর কেন?

হাঁ চম্পা, আমি বড় নিষ্ঠুর।

চম্পার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, অতি সন্তর্পণে চেপে গেলো চম্পা নিশ্বাসটাকে।

বনহুর বললো—চম্পা, এবার আমার বিদায় নেবার সময় এসেছে, তুমি যে বলেছিলে কি একটা জিনিস আমাকে পুরস্কার দেবে, কই দিলে না তো?

বাবু, ঠিক তোকে একটা জিনিস দেবো কিন্তু আমাকে তুই কিছু দিবি না বাবু?

বনহুর এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলো, চম্পার কথায় সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে বসে, স্থির নয়নে তাকায় ওর মুখের দিকে।

বনহুরের তীক্ষ্ণ সুন্দর দুটি চোখের কাছে চম্পার চোখ দুটো নত হয়ে আসে।

বনহুর চম্পার মুখখানা আজ নিজের হাতে তুলে ধরে, কিছুক্ষণ নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে দেখে সে চম্পার মুখ, তারপর বনহুর অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ......

বনহুরের হাসির শব্দে বনভূমি যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠে। হাসি থামিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে—চম্পা, কি চাও তুমি আমার কাছে?

যা চাই দিবি বাবু?

বলো?

তোর বুকে একটু মাথা রাখতে চাই......

চম্পা!

হাঁ বাবু, কতদিন থেকে আমার এ আশা......চম্পার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর কিছু বলতে চায়।

চম্পা তার পূর্বেই নত হয়ে মাথাটা বনহুরের বুকের মধ্যে গুঁজে দেয়, আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে—বাবু!

বনহুর চম্পার মাথায় হাত রাখে, এমন সময় বাইরে বুড়ীমা আর বিজয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

চম্পা এবার ছুটে বেরিয়ে যায় কুটিরের মধ্য হতে।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে চম্পার চলে যাওয়া পথের দিকে।

বুড়ীমা বিজয়াকে কুটিরে পৌঁছে দিয়ে তার কাজে চলে যায়।

বিজয়া চম্পাকে বেরিয়ে যেতে দেখে গম্ভীর হয়ে পড়ে।

কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে রাগত দৃষ্টি মেলে তাকায় বনহুরের দিকে।

বনহুর নিজকে স্বাভাবিক করে নিয়েছে ততক্ষণে।

বিজয়ার মুখোভাব লক্ষ্য করে মৃদু হাসে বনহুর। সে কোনো কথা না বলে নিশ্চুপ শুয়ে থাকে। দেখতে চায় বিজয়া কিছু বলে কিনা, কারণ বিজয়া চম্পাকে কুটির হতে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলো এবং সেই কারণেই মুখখানাকে গম্ভীর করে ফেলেছিলো। চম্পার আচরণে মোটেই খুশী ছিলো না বিজয়া।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়।

বিজয়া পারে না বেশীক্ষণ নিশ্চুপ থাকতে, এক সময় এসে বসে বনহুরের পাশে।

বনহুর বলে—কিছু বলবে বিজয়া?

চম্পা কেন এসেছিলো?

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—ওরই ঘরে ও কেন এসেছিলো, এ প্রশ্ন করা তোমার উচিত হয় না বিজয়া। কারণ এ ঘর ওদের......

বিজয়া এ কথার পরে কোনো কথা বলতে পারে না।

বনহুর একটু থেমে আপন মনেই বলে উঠলো—নারীজাতি বড়ই রহস্যময়ী......তাদের বুঝা বড় মুস্কিল।

বিজয় চোখ তোলে।

বনহুর হেসে বলে—বলো বিজয়া সত্যি কিনা?

এবার বিজয়া না হেসে পারে না।

বনহুর বিজয়ার হাতখানা তুলে নেয় হাতের মুঠায়, তারপর বলে—আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট করলে বিজয়া, তোমাকে আমি পারলাম না কিছু দিতে। বিজয়া?

বলো তিলক?

আজ তুমি আমার পাশে থেকে আমাকে অনেক সহায়তা করেছো, অনেক সাহস দিয়েছো কিন্তু আমি বড় নিষ্ঠুর, কোনোদিন বুঝলাম না বা বুঝতে চেষ্টা করলাম না তোমার মনের কথা।

বিজয়ার মুখখানা ম্লান হয়ে আসে, সে জানে তিলক সাধারণ মানুষ নয়, তাকে জীবনে পাবার আশাও নেই কারণ সে বলেছে সে বিবাহিত—তার স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। তবু বিজয়া ভালবেসেছিলো ওকে, যার জন্য সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে এসেছিলো তিলকের সঙ্গে কিন্তু বিজয়া ওকে কোনোদিন ঘনিষ্ঠভাবে পায়নি কাছে। যখনই সে তিলকের কাছে নিবিড় হয়ে এসেছে তখনই তার মধ্যে একটা অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করেছে। আজ তিলকের হাতের মুঠায় বিজয়ার হাতখানা শিথিল হয়ে আসে, হৃদয়ে একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি নাড়া দিয়ে যায়। বিজয়া নিজকে সামলে নেয়, কারণ নিজের দুর্বলতা তিলকের কাছে ধরা পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি সরে যায় সে ওর কাছ থেকে।

বনহুর আপন মনেই হেসে উঠে, কারণ সে বুঝতে পেরেছে বিজয়া ভয় পেয়ে গেছে হঠাৎ যদি তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মেয়েরা যতই সহজ হোক পুরুষদের দুর্বলতা লক্ষ্য করলে তারা তখন সজাগ হয়ে উঠে, একটা কঠিন মনোবল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তাদের মধ্যে। কোন নারীই চায় না নিজের নারীত্বকে বিসর্জন দিতে। বিজয়ার আচরণে বনহুর খুশী হয়।

এই ঘটনার পর বিজয়া প্রায়ই বনহুরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। পূর্বের মত সে আর সহজভাবে আসে না তার কাছে।

❑

পর পর কয়েকদিন নূরী চম্পার কক্ষে ঘুমিয়েছে। গভীর রাতে কার নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পেয়েছিলো, তারপর থেকে সে একা ঘুমাতে সাহসী হয়নি।

চম্পাও ওকে একা থাকতে দেয়নি পাশের ঘরে। তা ছাড়া রাতে একটি দিনও চম্পা নূরীকে ছেড়ে যায়নি কোথাও। সব সময় চম্পা নূরীর পাশে পাশে থাকে, বিশেষ করে রাতের বেলায়।

অন্যান্য দিনের মত আজও চম্পা আর নূরী এক শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে ছিলো।

গভীর রাত।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে যায় নূরীর, চমকে উঠে সে—কই, পাশে তো চম্পা নেই। ভাল করে হাতড়ে দেখে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে নূরী, একটা ভীত ভাব তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কক্ষটা জমাট অন্ধকারে ঢাকা, কিছুই নজরে পড়ছে না।

একদণ্ড দু'দণ্ড করে কয়েক দণ্ড কেটে যায়।

ঘুম আর আসছে না নূরীর চোখে, চম্পা তাকে এমন করে রেখে কোথায় চলে গেছে কে জানে! নূরী গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো, কেউ যেন প্রবেশ করলো তার কক্ষমধ্যে। পদশব্দ বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে কেউ অতি সন্তর্পণে।

স্তব্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে নূরী কোনো এক ভীষণ মুহূর্তের।

পদশব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে।

নূরী কোনো দিন এত ভীত ছিলো না, আজ তার সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তাকে এখন একা ফেলে মোটেই চম্পার চলে যাওয়া উচিত ছিলো না, ভাবছে নূরী। সেই নিশ্বাসের শব্দ, কাছে আরও কাছে সরে আসছে ক্রমান্বয়ে।

নূরী চীৎকার করবে কিনা ভাবছে ঠিক সেই দণ্ডে বাইরে কারো পদশব্দ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষমধ্য হতে কেউ যেন দ্রুত বেরিয়ে গেলো পাশের দরজা দিয়ে।

নূরী দেখলো, দরজা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো চম্পা। তার পিছনে একজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার হাতে লণ্ঠন থাকায় নূরী সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

চম্পা কক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী শয্যায় উঠে বসলো, তারপর কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো—চম্পাদি, তুমি আমাকে একা ফেলে চলে গিয়েছিলে? আজ আবার সেই শব্দ......সেই নিশ্বাসের শব্দ...উঃ কি সর্বনাশ, ভাগ্যিস, তুমি এসে পরেছিলে তাই রক্ষা।

চম্পা হাত তালি দিলো।

তৎক্ষণাৎ কক্ষে প্রবেশ করলো একটি লোক।

চম্পা বললো—তোমাকে না পাহারায় রেখে গিয়েছিলাম, কে এসেছিলো এ কক্ষে?

লোকটা হাত কচলে বললো—বড় শীত, তাই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম।

নূরী তাকিয়ে দেখলো লোকটা একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁদছে।

চম্পা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

মাথা নীচু করে রইলো লোকটা।

চম্পা ধমক দিলো—বেরিয়ে যাও।

লোকটা দ্রুত চলে গেলো।

নূরীর কেমন যেন সন্দেহ হলো লোকটাকে, কিন্তু সে কোনো কথা বললো না।

চম্পা বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে বললো—প্রথমেই বলেছিলাম, আমি গেলেই এমনি একটা বিভ্রাট ঘটবে! যাও তুমি এবার।

বৃদ্ধা চলে গেলো।

চম্পা নূরীর পাশে এসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—আমি জানতাম এমনি একটা কিছু হবে তবু না গিয়ে পারিনি, কারণ আমার মা হঠাৎ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। তা ভয় নেই, আর কেউ আসতে পারবে না। চলো নূরী, এবার আমরা ঘুমাই।

নূরী নীরবে শয্যা গ্রহণ করলো কিন্তু তার কানে তখনও সেই নিশ্বাসের শব্দ বাজছিলো।

সমস্ত রাত আর ঘুম এলো না নূরীর চোখে, কে সেই লোক যে একদিন নয়, পর পর দু'দিন তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো। কি উদ্দেশ্য ছিলো তার, নিশ্চয়ই সৎ মতলব নিয়ে কেউ তার কক্ষে প্রবেশ করেনি।

নূরীর আর ভাল লাগে না, মনটা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। চম্পার কি উদ্দেশ্য, তার হুরকে সে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছে কিন্তু কেন তার কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, কিছুই বুঝতে পারে না নূরী।

যত ভাবে সে ততই সব যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে আসে।

এরপর আরও কয়েকদিন কেটে যায়।

বনহুরের জন্য অস্থির হয়ে উঠে নূরীর মন।

চম্পা বুঝতে পারে, সে সব সময় নূরীকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কোনোদিন ওকে সঙ্গে করে শিকারে যায়, কোনোদিন বজরায় নদীবক্ষে ভেসে চলে, প্রাকৃতির দৃশ্য উপলব্ধি করে ওরা অন্তর দিয়ে।

❑

সেদিন নূরী ঘুমের ভাণ করে শুয়ে ছিলো।

রাত গভীর।

চম্পা মনে করে নূরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

দরজার বাইরে একটা শব্দ হলো।

চম্পা শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

নূরী রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করছে কি করে চম্পা বা কোথায় যায় সে।

চম্পা শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে চললো দরজার দিকে। দরজার পাশে এগুতেই দরজা আপনা আপনি খুলে গেলো।

চম্পা বেরিয়ে গেলো বাইরে।

নূরীও চম্পাকে অনুসরণ করলো অতি সন্তর্পণে। অন্ধকারে আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো সে।

চম্পা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক সসম্মানে তাকে অভিবাদন জানালো। আজও সেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেলো নূরী। বৃদ্ধা চম্পার পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে।

নূরীও অতি সতর্কতার সঙ্গে চম্পাকে অনুসরণ করে চলেছে।

চম্পা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটা বড় গাছের নিকটে এসে দাঁড়ালো।

অনুচরদ্বয় গাছের গুঁড়ির পাশে একটা জায়গায় মাটিতে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে একট বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো, গাছের দেহটা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেলো। ঠিক একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে।

এবার চম্পা সেই সুড়ঙ্গপথে ভিতরে প্রবেশ করলো। তার অনুচরদ্বয়ও চম্পাকে অনুসরণ করলো। বৃদ্ধাও প্রবেশ করলো সর্বশেষে।

ওরা চলে গেলো কিন্তু সুড়ঙ্গপথ ঠিক পূর্বের মত উন্মুক্ত রইলো।

নূরী এগুবে সেই মুহূর্তে একটি ছায়ামূর্তি সকলের অগোচরে সুড়ঙ্গমধ্যে ঢুকে পড়লো।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো নূরী। অন্ধকার হলেও সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, চম্পাকে সেই শুধু অনুসরণ করেনি আরও কেউ তাকে লক্ষ্য করছে এবং সে চম্পা ও তার অনুচরদের অনুসরণ করে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেছে। নূরীর মন থেকে সব ভয়-ভীতি উবে যায়, সেও দ্রুত সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করে।

সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করে অবাক হয় নূরী, কারণ কোন্ দিকে কোথায় বা পথ সে বুঝতে পারে না। কোন্ দিকেই বা গেলো তারা। তবু সে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ এগুনোর পর হঠাৎ একটু আলোর রশ্মি দেখতে পেলো। এবার নূরী সেই আলোকরশ্মি লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো।

নূরীর বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করছে। না জানি আজ সে কি দেখতে পাবে!

কিছুটা এগুনোর পর হঠাৎ নূরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, সম্মুখে বিরাট একটা প্রশস্ত জায়গায় একটি স্বর্ণ আসনে জমকালো ড্রেস পরিহিতা অবস্থায় বসে আছে চম্পা। নূরী বিস্ময়ভরা নয়নে দেখলো এখনকার চম্পা আর সে চম্পায় যেন অনেক পার্থক্য।

চম্পা স্বর্ণ আসনে উপবেশন করেছে। তার সম্মুখে অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক অস্ত্রশস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান রয়েছে। চম্পার দু'পাশে দু'জন অদ্ভুত পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতেও মারাত্মক অস্ত্র।

❑

আজ নূরী চম্পার চোখেমুখে এক কঠিন ভাব লক্ষ্য করে। মশালের উজ্জ্বল আলোতে তার চোখ দু'টো যেন জ্বলছে। নূরী অবাক হয়ে দেখতে থাকে।

যে জায়গায় নূরী দাঁড়িয়ে ছিলো সে জায়গাটা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুড়ঙ্গপথের একটা বাঁকের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো সে।

নূরীর অদূরে আর একটা ঢিপির আড়ালে আরো একজন আত্নগোপন করে দাঁড়িয়ে দেখছিলো চম্পার কার্যকলাপ। নূরী তাকে দেখতে পায়নি, সেও দেখতে পায়নি নূরীকে।

নূরী চম্পার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। চম্পা যে একজন অসাধারণ নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? ভীল যুবতী চম্পাই কি তার আসল রূপ?

চম্পা গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো—মাহমুদ আলী!

সঙ্গে সঙ্গে একজন সরে এলো দলের মধ্য হতে, চম্পার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো, তারপর লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

চম্পা বললো—কি সংবাদ মাহমুদ আলী?

নীল নদের প্রবেশপথে অসংখ্য পুলিশ পাহারারত রয়েছে। যে কোনো জাহাজ ঐ পথে অগ্রসর হলে সে জাহাজকে আটক করা হচ্ছে এবং কান্দাই-এর পুলিশ সুপার মিঃ জাফরী নিজে খানা-তল্লাশী চালাচ্ছে।

চম্পা এবার হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমি জানি, পুলিশ সুপার মিঃ জাফরী নীল নদের প্রবেশপথে কড়া পাহারা নিযুক্ত করেছে, বনহুরকে গ্রেপ্তার করে দু'লক্ষ টাকা পুরস্কার নেবে আর তার সঙ্গে সুনাম। কিন্তু আমি সব জানতে পেরে মিঃ জাফরীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছি। মাহমুদ আলী, তোমরা কোন্ পথে এখানে পৌছলে?

রাণীজী, আমরা নীলনদের পথে না এসে জঙ্গীনদের মধ্য দিয়ে এসেছি, সেই কারণে এত বিলম্ব হয়েছে।

হীরালাল ও তার দলবলকে দেখছি না কেন?

এবার মাহমুদ আলী তার বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর বলে—হীরালাল তার দলবলসহ নীল নদের প্রবেশপথে কান্দাই পুলিশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে—

চম্পা গর্জন করে উঠে—কি বললে মাহমুদ আলী, হীরালালকে কান্দাই পুলিশ বাহিনী গ্রেফতার করেছে?

হাঁ রাণীজী।

আমি এরকমই অনুমান করেছিলাম! হীরালালের দলে কতজন ছিলো?

পঞ্চাশ জন আমার সঙ্গে, পঞ্চাশ জন হীরালালের সঙ্গে তার জাহাজে ছিলো।

সে কি করে ধরা পড়লো মাহমুদ আলী?

আপনার আদেশ অনুযায়ী আমরা নীল নদের প্রবেশপথের সীমানা ছাড়িয়ে নদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম কিন্তু কান্দাই পুলিশ জাহাজ সমস্ত নীল নদে ছড়িয়ে ছিলো, তারা কৌশলে হীরালালের জাহাজখানাকে আটক করে ফেলে।

আর তুমি কি করে রেহাই পেলে?

আমার জাহাজ হীরালালের জাহাজের অনেক পিছনে ছিলো তাই আমি রক্ষা পেয়েছি। হীরালালের জাহাজখানাকে যখন পুলিশ জাহাজ আটক করে তখন আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে পাই এবং সাবধান হই। সঙ্গে সঙ্গে আমার জাহাজখানাকে পিছু হটে যাবার নির্দেশ নেই। তারপর জঙ্গীনদ হয়ে তবে এখানে পৌছতে সক্ষম হই।

আর একটা বিপদ মাথায় বয়ে নিয়েই এসেছো, হীরালাল তাহলে পুলিশ সুপার মিঃ জাফরীর হাতে বন্দী হয়েছে।

হাঁ রাণীজী।

যাক্, সে চিন্তা আমি পরে করবো। এখন যে কারণে আমি তোমাদের ডেকেছি শোন।

বলুন রাণীজী?

তোমরা জানো, দস্যু বনহুর এখন আমাদের এই সূরজ দ্বীপে রয়েছে। শুধু সেই নয়, তার সঙ্গিনী নূরীও রয়েছে আমার কাছে। আমি চাই না এদের কোনো অমঙ্গল হয় এবং সেই কারণেই আমি তোমাদের ডেকেছি।

আদেশ করুণ রাণীজী?

হীরালাল বন্দী, কাজেই তোমাকেই সব কাজ করতে হবে। বনহুর ও নূরীসহ কান্দাই-এর পথে রওয়ানা দেওয়া দরকার কিন্তু তার পূর্বে নীলদ্বীপে যেতে হবে তোমাদের, কারণ নীলদ্বীপের রাকজন্যা বিজয়াও আছে এখানে।

আপনার কথামত কাজ করবো কিন্তু কিভাবে আমরা রওয়ানা দেবো জানতে চাই রাণীজী।

সে কথা পরে বলবো। আজ তোমরা যাও বিশ্রাম করোগে।

মাহমুদ আলী চম্পাকে অভিবাদন জানিয়ে দলবলসহ চলে যায়। সুড়ঙ্গপথে বাইরে না গিয়ে তারা ভিতর পথে কোথায় যে অদৃশ্য হয় নূরী আর তাদের দেখতে পায় না।

❑

এবার নূরী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে জানে চম্পার কাজ শেষ হয়েছে, এবার সে সুড়ঙ্গ হতে বেরিয়ে যাবে। কাজেই তাকে তার পূর্বেই সরে যেতে হবে কিন্তু চম্পার আসন ত্যাগ করার লক্ষণ দেখা গেলো না।

দরবার-স্থান শূন্য হলেও বৃদ্ধা তখনও দাঁড়িয়েছিলো আর দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন পাহারাদার যারা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে চম্পার আসনের পিছনে প্রতীক্ষা করছিলো।

চম্পাকে লক্ষ্য করে বললো বৃদ্ধা—রাণীজী, দস্যু-সম্রাটকে আপনি একেবারে হাবা-গোবা বানিয়ে তাকে বোকা বানিয়ে রেখেছেন। আর কতদিন দু'জনাকে দু'জনার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবেন?

চম্পা তার পাহারাদারগণকে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দিল।

ওরাও চলে গেলো, এবার দরবারে শুধু চম্পা আর বৃদ্ধা।

চম্পা এবার বলে—দু'জনাকে সরিয়ে রাখার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিলো, কারণ নূরীকে পেলেই বনহুর বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আমি বা কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবো না। কিন্তু তার পূর্বেই আমি জানতে পেরেছি, কান্দাই পুলিশ বাহিনী কোনো ক্রমে জানতে পেরেছে দস্যু বনহুর নীলনদ হয়ে নীলদ্বীপ অভিমুখে এসেছে, তাই তারা অসংখ্য পুলিশ বাহিনী সহ বেশ কিছু জাহাজ নিয়ে সমগ্র নীলনদে রীতিমত পাহারা দিচ্ছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা তাদের উদ্দেশ্য এবং জীবনপণ করে তারা সতর্ক পাহারায় রয়েছে। আমি তাই আমার লোকজন ও জাহাজ আনয়ন করলাম আর সেই কারণেই উভয়কে উভয়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু......আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় চম্পা।

সেই অবসরে নূরী অন্ধকারে সরে পড়ে সেখান থেকে।

অতি সন্তর্পণে নিজের শয্যায় এসে শুয়ে পড়লো। জমাট অন্ধকারে বুকটা তার ধক্ ধক্ করছিলো, তবুও একটা আনন্দ তার সমস্ত অন্তরে ফুলের সুবাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সে জানতে পেরেছে চম্পার উদ্দেশ্যের কথা। তার প্রিয়ের কাছ থেকে কেন তাকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

দু'চোখ বন্ধ করে বনহুরের কথা ভাবতে থাকে নূরী।

হঠাৎ পিছনের জানালা খুলে যায়, কেউ যেন প্রবেশ করে তার কক্ষমধ্যে।

চমকে উঠে নূরী, শিউরে উঠে তার শরীর। একখানা ঝাপসা মুখ ভেসে উঠে তার চোখের সামনে, সে মুখখানা মাঝি হরিনাথের। মাথায় পাগড়ীর

মত করে একটা গামছা জড়ানো, মুখে গালপাট্টা বাঁধা। শুধু চোখ দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সেদিন, কেমন যেন কটমট করে তাকাচ্ছিলো তার দিকে। ভীত ভাব নিয়ে অন্ধকারে তাকায় নূরী যেদিক থেকে পদশব্দটা আসছিলো সেইদিকে।

শব্দটা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে।

স্তব্ধ নিশ্বাসে নূরী প্রতীক্ষা করছে, আজ তার রক্ষা নেই, শয়তান হরিনাথ তাকে আক্রমণ করে বসবে। চম্পাতো এখনো এলো না, সে এসে পড়লে তবু তার রক্ষা ছিলো।

কিন্তু ভাবার সময় আর কই, নূরীর শয্যার অতি নিকটে পদশব্দের সঙ্গে একটা নিশ্বাসের শব্দও কানে আসে তার।

নূরীর সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে, মনে মনে সে খোদাকে স্মরণ করে চলে।

জমাট অন্ধকারে নূরী তাকালো কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না, শুধু একটা ছায়ামূর্তি তার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

নূরী তীব্র চীৎকার করে উঠলো—বাঁচাও......

সঙ্গে সঙ্গে একটা বলিষ্ঠ হাত তার মুখের উপর এসে পড়লো।

কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, নূরীর চীৎকার শুনে দু'জন পাহারাদার ছুটে এলো আলো হাতে।

দরজার বাইরে আলো ছটা দেখে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নূরীর মুখখানা মুক্ত হয়ে গেলো। ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে দরজা খুলে যাবার আগেই, কারণ পিছনের জানালা মুক্ত ছিলো।

পাহারাদারদ্বয় আলো হাতে কক্ষমধ্যে এসে দাঁড়াতেই তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো চম্পা। চোখেমুখে তার বিস্ময়, বললো—কি হয়েছে?

নূরী চম্পার দিকে তাকিয়ে দেখলো তখনকার চম্পা আর এখনকার চম্পার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এখন তার দেহে নেই সেই অদ্ভুত জমকালো ড্রেস। চোখে নেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গঝরা দৃষ্টি।

চম্পা নূরীর পাশে গিয়ে কাঁদে হাত রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে নূরী?

নূরী ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো—সেই নিশ্বাসের শব্দ, সেই ছায়ামূর্তি আজ আবার এসেছিলো। তুমি কোথায় গিয়েছিলে চম্পাদি?

একটু বাইরে গিয়েছিলাম। আজ আবার সে আসবে জানতাম না।

নূরীর মুখ থেকে তখনও ভীতি মুছে যায়নি। সে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো—শয়তানটা বড় ভয়ঙ্কর। কি ভীষণ চেহারা......

চম্পা তার লোকদের আদেশ দিলো—যাও সমস্ত বাড়ীখানা তল্লাশী চালাও।

সবাই বেরিয়ে যায়।

চম্পা বলে—শুয়ে পড়ো নূরী।

চম্পাদি, তোমার ভয় করছে না?

ভয়......খিল খিল করে হেসে উঠে চম্পা, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—ভয় করবো! জঙ্গলে আমার জন্ম। হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে আমার বসবাস। শয়তান লোকদের নিয়ে আমাকে সময় কাটাতে হয়, কাজেই ভয় আমি কাউকে করি না।

নূরীও চম্পার চেয়ে কম নয়, সে যে দস্যু কন্যা এবং দস্যুর স্ত্রী তবু তার মনে দুর্বলতা, কারণ সে নারী। জীবন-মন দিয়ে সে একজনকে ভালবেসেছিলো—তাকেই সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে, তার সব কিছু সমর্পণ করেছিলো তাকে। কোনোদিন সে অপর জনকে চিন্তা করেনি, তাই অপর জনকে এত ভয় তার।

নূরী এটুকু জানে, সতীত্বই নারীর জীবনের পরম সম্পদ। যে সম্পদ একবার নষ্ট হলে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফিরে পাওয়া যায় না।

চম্পা নূরীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর বলে—খুব ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

হাঁ খুব।

চম্পার পাশে শুয়ে নূরী বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো। আজ সে ওর আসল রূপ দেখতে পেয়েছে। চম্পাকে অন্যান্য দিনের মত আজ সচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারে না নূরী। সে নিশ্চুপ শুয়ে থাকে। চম্পা নূরীর মনোভাব বুঝতে পেরে মৃদু মৃদু হাসে।

□

সম্মুখের টেবিলে ম্যাপখানার উপরে নজর রেখে কিছু অন্বেষণ করে চলেছেন মিঃ জাফরী। পাশে দাঁড়িয়ে মিঃ ইলিয়াস এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। সকলের চোখেমুখেই একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ভাব। ম্যাপখানায় দৃষ্টি রেখে কিছু সন্ধান করে চলেছেন তাঁরা।

মিঃ ইলিয়াস কান্দাই পুলিশ গোয়েন্দা। তিনি পূর্বে গোয়েন্দাগিরিতে বহু সুনাম অর্জন করেছেন। জীবনে বহু চোর, ডাকু-বদমাশকে তিনি কৌশলে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন। দস্যু বনহুর গ্রেফতারেও তিনি বহুদিন হতে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন কিন্তু সফলতা অর্জন করতে পারেননি। এবার মিঃ ইলিয়াস মিঃ জাফরীর সঙ্গে নীলনদে এসেছেন। অবশ্য দস্যু বনহুর যে নীল নদ হয়ে নীলদ্বীপ অভিমুখে রওনা দিয়েছিলো, এ কথা গোপনে সংগ্রহ করেছিলেন মিঃ ইলিয়াস।

মিঃ ইলিয়াসের বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনাই মিঃ জাফরীর মনে নতুন আশা সৃষ্টি করেছিলো। অবশ্য তাঁর নিজের ইচ্ছাও কম ছিলো না। দস্যু বনহুর গ্রেফতার ব্যাপার নিয়েই তিনি কান্দাই এসেছিলেন এবং সে কারণেই বহুদিন তিনি কান্দাই রয়ে গেছেন! দস্যু বনহুরের কাছে মিঃ ইলিয়াস নাকানি-চুবানিও কম খাননি এবং সেই কারণেই তাঁর এত আক্রোশ যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করে তাকে কাহিল করবেন।

কোনো এক পুলিশ গুপ্তচরের কাছেই দস্যু বনহুরের নীলনদে গমনের সংবাদ সংগ্রহ করে মিঃ জাফরী এবং মিঃ ইলিয়াস বেশ কিছুসংখ্যক পুলিশ-ফোর্স নিয়ে আজ চল্লিশ দিন ধরে তল্লাশী চালান, কারণ বনহুর সবার চোখে ধূলো দিতে পারবে কিন্তু জাফরীকে সহজে ধোঁকা দিতে পারবে না।

মিঃ জাফরীকে নীলদ্বীপ পুলিশ বাহিনীও সাহায্য করছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু পুলিশ-ফোর্স দিয়েছেন নীলদ্বীপ সরকার।

নীলদ্বীপের মহারাজ হিরন্ময় কিন্তু এব্যাপারে মোটেই অবগত ছিলেন না, কারণ তিনি তখন কোনো কারণে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছিলেন।

মিঃ জাফরী চল্লিশ দিন অবিরাম পরিশ্রম চালিয়েও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। এতদিনে তাঁরা কয়েক শত জাহাজে খানা তল্লাশী চালিয়ে হয়রান পেরেশান হয়েছেন। অবশ্য কয়েকটি জাহাজে সন্দেহজনক কিছু জিনিসপত্র এবং লোকজনকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছেন।

গত পরশু মিঃ ইলিয়াস কিছুসংখ্যক পুলিশ-ফোর্স নিয়ে একটি জাহাজ আটক করেছেন এবং জাহাজের পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন।

মিঃ জাফরী গভীর মনোযোগ দিয়ে ম্যাপখানা লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনি ম্যাপখানার এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠলেন—এই সেই জঙ্গীনদের মোহনা, যে পথে আর একখানা জাহাজ উধাও হয়েছে।

মিঃ ইলিয়াস ঝুঁকে পড়লেন, ম্যাপখানায় নজর দিয়ে বললেন—ঠিক বলেছেন স্যার, দ্বিতীয় জাহাজখানা ঐ পথেই অদৃশ্য হয়েছে।

মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে চলেছেন, তাঁর চোখে মুখে একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে।

দণ্ডায়মান একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন—স্যার, আমার মনে হচ্ছে দস্যু বনহুরের অনুচর এরা। একখানা জাহাজ আমাদের কবলে আটকা পড়েছে আর একখানা পালাতে সক্ষম হয়েছে।

অপর অফিসার বলে উঠলেন—আমারও ঐ রকম মনে হচ্ছে স্যার।

মিঃ জাফরী বললো—এ জাহাজে কতজন লোক ছিলো?

মিঃ ইলিয়াস বললেন—জাহাজের মাঝি-মাল্লাসহ প্রায় চুয়ান্ন জন হবে। কিন্তু পঞ্চাশ জন লোকের একই রকম ড্রেস এবং তারা অতি বলিষ্ঠ চেহারার লোক। একজনকে দলের নেতাবলে মনে হলো। স্যার, আপনি এদের পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, কারণ এদের মধ্যেও দস্যু বনহুর আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

মিঃ জাফরী ম্যাপখানাকে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললেন—এদের কত নম্বর জাহাজে বন্দী করে রেখেছেন?

এবার জবাব দিলেন মিঃ জাফরীর সহকারী মিঃ গুহ—স্যার, ৩নং জাহাজে এদের আটক করে রাখা হয়েছে।

আজই আমি পরীক্ষা করে দেখবো। দস্যু বনহুরকে আমি নিশ্চয়ই চিনতে পারবো। তবে এদের মধ্যে দস্যু বনহুর নেই কারণ দস্যু বনহুর এত সহজে ধরা দেবার বান্দা নয়।

মিঃ জাফরীর কথা শেষ হতে না হতে ক্যাবিনে প্রবেশ করেন মিঃ লেহরী। ইনি পুলিশ ইন্সপেক্টার। আপাততঃ মিঃ জাফরীর সহকারী হিসাবে কাজ করছেন। ক্যাবিনে প্রবেশ করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—স্যার, সেই লোকটা ভেগেছে...

কোন্ লোকটা? বললেন মিঃ জাফরী।

যে জাহাজখানা আটক করা হয়েছে সেই জাহাজের দলে যাকে দলের সর্দার বলে সন্দেহ করা হয়েছিলো সেই লোক।

মিঃ জাফরী এবং ইলিয়াস একসঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন—দলের সর্দার পালিয়েছে?

মিঃ গুহ এবং মিঃ হারেশ যাঁরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা বিস্ময়ে চমকে উঠলেন।

মিঃ হারেশ বললেন—কিভাবে সে পালাতে সক্ষম হলো? তাকে তো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো?

মিঃ লেহরী বলে উঠেন—আশ্চর্যভাবে লোকটা পালিয়েছে স্যার। শিকলের সঙ্গে একখানা হাত তার এখনও ঝুলছে।

কি বললেন মিঃ লেহরী? মিঃ জাফরী যেন অদ্ভুত শব্দ করে উঠলেন।

মিঃ লেহরী বললো—চলুন দেখবেন স্যার বিস্ময়কর ভাবে পালিয়েছে লোকটা।

মিঃ জাফরী দলবলসহ চললেন।

৩নং জাহাজখানা তখন ১ নং জাহাজের সঙ্গে এসে ভিড়েছে। সাঁকো ফেলা হয়েছে। মিঃ জাফরী, মিঃ ইলিয়াস এবং অফিসারদ্বয় সাঁকো বেয়ে ৩ নং জাহাজে গেলেন। মিঃ লেহরী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে, তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

মিঃ জাফরী বিশাল বপু নিয়ে সাঁকো পার হয়ে ওপারে এলেন। তাঁর দলবলও এসে পড়লো ৩নং জাহাজে।

মিঃ লেহরী সহ মিঃ জাফরী ৩ নং জাহাজের বন্দীশালার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বৃহৎ আকার বন্দীশালায় বন্দী করে রাখা হয়েছে হীরালালের সবগুলো অনুচরকে। আর হীরালালকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো পাশের ক্যাবিনে। তার হাতে লৌহশিকল আটকানো ছিলো।

মিঃ জাফরী দলবলসহ ক্যাবিনে প্রবেশ করে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন। তাঁরা দেখলেন ক্যাবিনের গায়ে লৌহশিকলের সঙ্গে ঝুলছে একখানা রক্তাক্ত বলিষ্ঠ হাত। হাতখানা কোনো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে ক্যাবিনের মেঝেতে! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—সাংঘাতিক।

মিঃ লেহরী বললেন—লোকটাকে দেখলে স্যার যে কোনো মানুষের মনে ভয় জাগবে।

মিঃ ইলিয়াস্ব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কতখানি ভয়ঙ্কর হলে এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে তা বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

মিঃ গুহ বললেন—লোকটা দস্যু বনহুর না হয়েই যায় না, কারণ তাকে কেউ বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি কোনোদিন।

মিঃ জাফরী বললেন—দস্যু বনহুর কোনো সময় নিজের অঙ্গহানি করে পালাবে না, তবে অনুচর হবে নিশ্চয়ই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ লেহরীকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ ইলিয়াস—লোকটা পালালো কোন পথে?

মিঃ লেহরী আংগুল দিয়ে ক্যাবিনের পিছন দিকের একটা ভেন্টিলেটার দেখিয়ে দিয়ে বললেন—স্যার, ঐ দিক দিয়ে লোকটা সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছে।

মিঃ জাফরী, মিঃ ইলিয়াস ও অফিসারদ্বয় দেখতে পেলেন ক্যাবিনের পিছন দিকে রক্তের ধারা চলে গেছে ভেন্টিলেটার টার দিকে। রক্তের ধারা জমাট বেঁধে আছে, লোকটা ঠিক ভোর রাতের দিকে পালিয়েছে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ-হয়ে গেছেন সবাই, তাঁরা বহুদিন বহু বন্দীকে আটক রেখেছেন, পালাতেও দেখেছেন অনেককে কিন্তু এমন ভয়ঙ্কার অবস্থা তাঁরা

দেখেননি কোনোদিন। লোকটা কতখানি ভয়ঙ্কর ছিলো তার কল্পনা করা যায় না।

মিঃ জাফরী তাঁর সহকারিগণসহ এবার বন্দীদের ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখলেন কি ভয়ঙ্কর এক-এক জনের চেহারা। কিন্তু সকলের দেহে একই রকম পোশাক।

মিঃ জাফরী সবাইকে তীক্ষ্ণ নজরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তিনি জানেন, এদের কিছু প্রশ্ন করে কোনো ফল হবে না, কেউ সত্য কথা বলবে না এই মুহূর্তে।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—এদের কান্দাই জেলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। জাহাজ থেকে এরা যে কোনো মুহূর্তে পালাতে পারে।

মিঃ জাফরী বললেন—হাঁ এদের কান্দাই জেলে পাঠানোই দরকার।

কথাগুলো অবশ্য নিম্নস্বরে বলছিলেন তাঁরা যাতে বন্দীরা শুনতে না পায়ে।

বন্দীদেরকে জানানো হলো না তাদের দলপতি সম্বন্ধে কোনো কথা। বন্দীদের ভালভাবে লক্ষ্য করার পর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন সবাই।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরী অন্যান্য জাহাজে এই সংবাদ ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলেন। নীল নদে প্রত্যেকটা জাহাজে পুলিশ বাহিনী যেন অনুসন্ধান চালায়।

মিঃ জাফরীর আদেশ পাওয়ামাত্র পুলিশ বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্র বাগিয়ে নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনুসন্ধান চালিয়ে চললো।

সমস্ত জলরাশি সার্চলাইটের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। বন্দী পালিয়েছে, তার একখানা হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, কাজেই সে সাঁতার কেটে সাগর পাড়ি দিতে পারবে না।

এখানে মিঃ জাফরী এবং তার দলবল যখন হীরালালকে নীলনদের গভীর জলে অনুসন্ধান করে চলেছে তখন হীরালাল ৩ নং জাহাজের পিছনে গোপন এক অংশে জলে দেহখানাকে ভাসিয়ে রেখেছে, যেমন করে হোক তাকে সূরজ দ্বীপে পৌছতে হবে।

❑

চম্পা তার স্বর্ণ আসনে উপবিষ্ট।

সম্মুখে দণ্ডায়মান মাহমুদ আলী ও তার দলবল। মাহমুদ আলী এবং তার দলবলের দেহে একই পোশাক, হাতে মারত্মক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

চম্পার দেহে জমকালো অদ্ভুত ড্রেস, চোখে-মুখে তার একটা দীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। মাহমুদ আলীকে কোনো কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলো চম্পা।

সুড়ঙ্গ মধ্যে অন্ধকারে আরও একজন গোপনে লুকিয়ে দেখছিলো সব। অতি সন্তর্পণে চম্পার কথাবার্তা সবকিছু শুনছিলো সে।

চম্পার স্বর্ণ আসন মশালের আলোতে ঝকমক করে জ্বলছে। আসনের পাশেই দণ্ডায়মান সেই বৃদ্ধা। আরও দুটি নারী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখে মুখেও উত্তেজনার চিহ্ন।

চম্পা মাহমুদ আলীকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে রক্তাক্ত দেহে ভিজে চপসে যাওয়া শরীরে একটি লোক দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে এলো। লোকটার দিকে নজর পড়তেই সুড়ঙ্গ মধ্যে দরবারকক্ষের সকলে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো।

চম্পা অস্ফুট আওয়াজ করে উঠলো—হীরালাল।

আড়ালে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তিও হীরালালকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। হীরালালের দেহ থেকে একখানা হাত উধাও হয়েছে, রক্তের মত লাল টকটকে কিছু মাংস ঝুলে আছে দেহের এক অংশে। সমস্ত দেহখানা হীরালালের রক্তে আর ভিজা কাদাতে বীভৎস আর বিকৃত হয়ে উঠেছে।

লোকটার দেহ অতি বলিষ্ঠ, চোখেমুখে যদিও বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে তবু সে মুখে নেই কোনো ক্লান্তির বা অবসাদের চিহ্ন। লোকটা দক্ষিণ হস্ত দিয়ে দেয়াল আঁকড়ে ধরে এগিয়ে এলো।

চম্পা আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো—হীরালাল, তোমার এ অবস্থা কেন?

মাহমুদ আলী ততক্ষণে হীরালালকে ধরে ফেলেছে।

চম্পার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো হীরালাল—রাণীজী, পুলিশ বাহিনীর বন্দী জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছি......

তোমার হাতের এ অবস্থা কেনো? বললো চম্পা।

হীরালাল তার রক্তাক্ত হাতের শেষ অংশের দিকে একবার তাকিয়ে বললো—লৌহশিকলে আটকানো হাতখানাকে ছিঁড়ে তবেই পালাতে সক্ষম হয়েছি রাণীজী।

কি সংবাদ বলো? তোমার সঙ্গীদের অবস্থাই বা কি? প্রশ্ন করলো চম্পা।

হীরালাল বললো—রাণীজী, আমার দলবল সকলেরই একই অবস্থা। সবাইকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমাকে ৩নং পুলিশ জাহাজের ভিন্ন এক ক্যাবিনে রাখা হয়েছিলো, আমি নিজের হাতখানাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পালিয়ে এসেছি।

পুলিশ জাহাজগুলো এখনোও কি নীলনদে প্রবেশ পথে অবস্থান করছে?

হাঁ রাণীজী, যতক্ষণ না তারা দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে পেরেছে ততক্ষণ তারা এইভাবে নীলনদের প্রবেশ মুখ আগলে রাখবে বলে মনে হলো।

পুলিশ বাহিনীদের জাহাজের সংখ্যা কত হবে?

আন্দাজ তিনি কিংবা চারখানা তার বেশীও হতে পারে। প্রত্যেকটা জাহাজে বিশ জনের বেশী পুলিশ ফোর্স রয়েছে। ১নং জাহাজে থাকে পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তাগণ......

চম্পার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো, হীরালালের কথার শেষ অংশ তার কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে । চম্পা বলে উঠলো—সাবাস হীরালাল। যাও এবার তোমার ছুটি। তারপর মাহমুদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললো—হীরালালের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও। আর ওকে এক লক্ষ স্বর্ণমোহর দিয়ে দাও ওর হাতখানার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ।

মাহমুদ আলী বললো—আচ্ছা রাণীজী।

চম্পা আবার বললো—আমাদের জাহাজ প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়েছে?

হাঁ রাণীজী।

কোন্ পথে যাওয়ার সাবস্থ করেছো মাহমুদ আলী?

জঙ্গীনদের দ্বিতীয় মোহনা দিয়ে আমাদের জাহাজ নীলদ্বীপের দিকে রওনা দেবে ঠিক করেছি।

চম্পা বলে উঠলো—পুলিশ বাহিনী যদি সেই পথের সন্ধান পেয়ে থাকে তাহলে?

মাহমুদ আলী বললো—যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় নেই রাণীজী, কারণ জঙ্গীনদের তিনটি মোহনা,—একটি দক্ষিণ দিকে অপর দুটি মোহনা ঠিক পাশাপাশি পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকেই এগিয়ে গেছে।

চম্পার ভ্রুজকুঁচকে গেলো, একটু ভেবে বললো—যেমন করে হোক রওনা দিতেই হবে। নীলদ্বীপের রাজকন্যা বিজয়াকে তার পিতামাতার কাছে পৌঁছে দিয়ে কান্দাই-এর দিকে যাত্রা করবো।

হীরালালের দলবলদের উদ্ধারকার্য নিয়ে কবে চিন্তা করবেন রাণীজী? —বললো মাইদি বুড়ী।

চম্পা বললো—নূরী আর বনহুরকে কান্দাই পৌঁছে দেবার পর সে চিন্তা করবো।

হীরালাল বলে উঠলো—রাণীজী, আমার মনে হয় পুলিশ বাহিনী বন্দীদের সমুদ্রমধ্যে বেশীদিন রাখবে না। তাদের কান্দাই জেলে পাঠাবে।

চম্পা বলে উঠলো—তার পূর্বেই আমরা বন্দীদের উদ্ধার নিয়ে প্রচেষ্টা চালাবো। যাও মাহমুদ আলী, যাত্রার আয়োজন করো গে।

মাহমুদ আলী দলবল এবং হীরালাল সহ চলে গেলো।

চম্পা দরবার কক্ষের সবাইকে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দিলো।

রাণীজীর আদেশে বেরিয়ে গেলো সবাই।

শুধু মাইদি বুড়ী রইলো চম্পার পাশে।

নিম্ন-স্বরে কিছু আলাপ চললো দু'জনার মধ্যে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি এতক্ষণ সব লক্ষ্য করছিলো। চম্পা যে একটি অসাধারণ নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই—হীরালালের একখানা হাতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে একলক্ষ স্বর্ণমোহর দিতে পারে! ছায়ামূর্তির চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছে যেন।

এবার কথা শেষ হলো চম্পার, মাইদি বুড়ি বেরিয়ে গেলো সোজা পথ দিয়ে।

চম্পা এগিয়ে চললো তার গোপন পথে।

এগুতেই অন্ধকারে পথ আগলে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি।

চম্পা চমকে উঠলো, বললো—কে?

ছায়ামূর্তি এবার কথা বললো—তুমি কে আগে সেই পরিচয় দাও?

আমি চম্পা।

না—তুমি চম্পা নও।

তুমি কে? আর আমার এ গোপন সুড়ঙ্গ পথে কি করেই বা প্রবেশ করলে?

যে পথে তুমি প্রবেশ করেছে।

এবার চম্পা অন্ধকারেই হেসে উঠলো—খিলখিল করে তারপর বললো—জানো তুমি কোথায় প্রবেশ করেছো?

জানি।

তুমি জানো না এখানে যে প্রবেশ করে সে আর কোনদিন ফিরে যেতে পারে না। তুমি আমার বন্দী......

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ছায়ামূর্তি—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ......

সে হাসির শব্দে সমস্ত সুড়ঙ্গমধ্যে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। চম্পা অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, দু'চোখে তার রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ছে—অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে— তুমি!

হাঁ, চিনতে পেরেছো?

এখানে কেন এসেছো তুমি?

তোমার আসল পরিচয় জানতে......

বাবু......

বাবু নই—বলো বনহুর!

তুমি......তুমি......

সব আমি জানি, তোমার আসল পরিচয়ও আমার অজানা নেই. আশা......

মুহূর্ত বিলম্ব হয় না একটা শব্দ শোনা যায়, বনহুর অবাক হয়ে দেখে তার সম্মুখে চম্পা নেই। এক নিমিষে সে যেন হাওয়ায় মিশে গেলো। বনহুর শুধু অনুভব করলো তার পায়ের নীচে মাটিখানা একটু দুলে উঠলো যেন।

বনহুর আর দাঁড়ালো না, সে দ্রুত বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গ হতে।

চমকে উঠে নূরী, ঘুম ভেংগে যায় তার। সেই শব্দ, ধীরে ধীরে কেউ যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

নূরী শিউরে উঠে, চম্পা আজ তার পাশে নেই। সে আজ দু'দিন হলো কোথায় যে উধাও হয়েছে তাকে নূরী আর খুঁজে পায়নি। মাঝে মাঝে মাইদি বুড়ি আসে সেই খোঁজ খবর নিয়ে যায় আর খাবার দিয়ে যায়। নূরীর বড্ড একা একা লাগছে, তাছাড়া ভয়ও লাগছে তার। না জানি কখন কোন বিপদ এসে পড়ে।

সবচেয়ে রাতের বেলায় নূরীর বড় ভয় লাগে, বিছানায় শুলেই তার কানে যেন ভেসে আসে সেই নিশ্বাসের শব্দ, ভারী পায়ের লঘু আওয়াজ। নূরীর বুক দূরু দূরু করে কেঁপে উঠে। সমস্ত রাত সে এক রকম প্রায় জেগেই কাটিয়ে দেয়।

নূরীর ধৈর্য থাকছে না, তার হুরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর কতদিন চম্পা তাকে তার বনহুরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। নূরীর মোটেই ভাল লাগে না। যতরাগ হয় তার চম্পার উপর, কেনো সে তার হুরের কাছে তাকে নিয়ে যাচ্ছো না। অনেক দিন অনেক প্রশ্ন করেছে নূরী কিন্তু চম্পা তাকে সঠিক কোন জবাব দেয়নি।

নূরী চম্পাকে যত দেখেছে ততই আশ্চর্য হয়েছে, সে যেন এক বিস্ময়-কর নারী। এমন গহন বনে সে বাস করে অথচ শহরের অট্টালিকার মত তার বাসস্থান। কিন্তু তার পোশাক পরিচ্ছদ ভীল কন্যার মত। চাল চলনে ধরা পড়ে আভিজাত্যের ছাপ। নূরীর মনে সন্দেহের দোলা, কে এই নারী?

নূরীর মনের কথা বুঝতে পারতো চম্পা, মৃদু মৃদু হাসে আরও নিজকে রহস্যময়ী করে তোলার চেষ্টা করে সে। চম্পার মনোভাব নূরী বুঝতে পারে না কারণ সে সরল সহজ মেয়ে।

মাঝে মাঝে নূরী যখন অত্যন্ত চিন্তা মগ্ন হয়ে পড়তো তখন চম্পা তাকে বোনের মত স্নেহ দেখাতো। কত কাহিনী শোনাতো তাকে নানা ছলনায়, যাতে সে ভুলে থাকে তার বনহুরকে।

কিন্তু নূরীর মনে যে সদা বনহুরের চিন্তা। বনহুরের জন্য সে নিজের শিশু সন্তানের মায়া বিসর্জন দিয়েছে, ছুটে এসেছে কোন অজানা অচেনা দ্বীপে। এখানে এলে সে তার বনহুরকে পাবে এটাই তার বড় কামনা।

নূরী একা একা সে কথাই ভাবছিলো তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল ছিলো না, হঠাৎ ঘুম ভেংগে যায়, শুনতে পায় সেই নিশ্বাসের চাপা শব্দ। সজাগ হয়ে উঠে সে, আজ বুঝি তার রক্ষা নেই।

ঠিক্ তার বিছানার পাশে এসে থামলো কে যেন।

অন্ধকারে ছায়ার মত লাগছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নূরী। দু'খানা হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে। নূরী চোখ মুদে ফেললো।

দু'খানা বলিষ্ঠ হাত ততক্ষণে নূরীকে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে।

চীৎকার করে উঠলো নূরী।

পরবর্তী বই
নীল পাথর-১

নীল পাথর-১ – ৫৪

❑

বলিষ্ঠ বাহু দুটি থেকে মুক্তি পাবার জন্য নূরী আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। আজ নূরীর চিৎকারে কেউ ছুটে এলো না। নির্জন বাড়ীখানা যেন থমথম করছে। নূরী ভীষণভাবে কামড়ে দিলো বলিষ্ঠ হাতখানার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো ছায়ামূর্তি—উঃ!

মুহূর্তে নূরীর মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠলো, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—কে?.....

নূরীর কানে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে ছায়ামূর্তি—আমি হরিনাথ মাঝি.....

হুর তুমি! অন্ধকারেই নূরী চিনতে পারে তার প্রিয়কে, দু'বাহু দিয়ে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে—এত বিপদের মধ্যেও তোমার সেই দুষ্টুমি.....

বনহুরের কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয় নূরী।

বনহুর ওকে আরো নিবিড় করে টেনে নেয়।

নূরী বলে উঠে—ছাড়ো।

উহুঁ, ছাড়বো না। কত সাধনার পর পেয়েছি.......

দুষ্টু!

যত খুশী বলো! একটু থেমে বলে—কতদিন এসেছি কিন্তু তোমার নাগাল পাইনি নূরী।

চোরের মত চুপি চুপি এলে নাগাল পাবে কি করে?

বনহুর নূরীর কানে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বললে—চোরই বটে। অমূল্য রত্ন চুরি করতে এসে যদি ধরা পড়ে যাই সেই ভয়ে....

নূরী হেসে বলে—হরিনাথ মাঝি সেজে তুমি.....

হাঁ, আমিই সব সময় ছায়ার মত পাশে ছিলাম তোমার। কতদিন সুযোগ খুঁজেছি তোমাকে কাছে পাবার জন্য, কিন্তু কি সাংঘাতিক মেয়ে তোমার জংলী মেয়ে সখীটা!

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—হুর, ওকে তুমি মন্দ বলো না—যেদিন তুমি নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে হরিনাথের বেশে, সেদিন চম্পার অনুচরগণ তোমাকে হত্যা করার জন্য তীর-ধনু বাগিয়ে ধরতেই চম্পা ওদের বারণ করেছিলো, তোমাকে লক্ষ্য করে তীর যেন না ছোড়ে। সত্যি, সেদিন আমি চম্পার উপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম ও তীর ছুড়তে দিলো না, বলে। ওর জন্যই তোমাকে আজ পেলাম হুর।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে উঠলো—শুধু একবার নয় নূরী, তোমার সখী আমাকে কয়েকবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে। এর কাছে আমি ঋণী....

নূরী বলে—হুর, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, চম্পাকে তুমি এর পূর্বেও দেখেছো?

হাঁ কিন্তু চিনতে পারিনি। চম্পার যে পরিচয় তুমি পেয়েছো সেটাই তার আসল পরিচয় নয়।

আমি জানি সে এক অসাধারণ মেয়ে।

তার চেয়েও বেশী। নূরী, তুমি জানো না, কিছুদিন পূর্বে তার সাহায্য আমাকে চরম এক মুহূর্ত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছে। ওর সহায়তা না পেলে সেদিন একটি সুন্দর ফুলের মত জীবন বিনষ্ট হয়ে যেতো, তাকে আমি উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম না।

কার কথা বলছো হুর?

সে এক মেয়ের কথা, নাম তার বিজয়া।

বিজয়া!

হাঁ। নীলা দ্বীপের রাজকন্যা বিজয়া—শোন তার কথা বলছি।

বনহুর বিজয়া সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলে সংক্ষেপে নূরীর কাছে। এ কথাও বলে সে—বিজয়া আজও এই সূরজ দ্বীপে রয়েছে, যাকে তুমি সেদিন ঘোমটার আড়াল থেকে আমার পাশে দেখেছিলে।

এবার হেসে উঠে নূরী—চিনেছিলে সেদিন তুমি আমাকে?

নূরীর কথায় বনহুরের মুখে হাসি ফুটে উঠে। অন্ধকারে নূরী বনহুরের হাসি দেখতে পায় না তবু সে বুঝতে পারে, বলে—তাইতো আমি পালিয়েছিলাম।

নাহলে তোমার সখীর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতো। আমি তোমার ঘোমটা সরিয়ে ফেলতাম। সত্যি নূরী, কি যে ধৈর্য নিয়ে সেদিন আমি ফিরে এসেছি সেই পর্ণকুটির থেকে.... এত কাছে পেয়েও তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারিনি...... কাছে পাইনি নিবিড় করে..... বনহুর নূরীকে আবেগভরা হৃদয়ে টেনে নেয় কাছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে—নূরী!

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে মধুর কণ্ঠে বলে নূরী—বলো?

নূরী, আজ আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে তোমাকে পেয়ে। নূরী—আমার নূরী.....

আমারও.....বনহুরের বুকে মুখ লুকায় নূরী। ভাবের আবেগে ভাষা হারিয়ে ফেলে যেন সে।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা যায়।

নূরী বলে উঠে—চম্পা আসছে।

বনহুর নূরীকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে বলে—তাহলে চলি এবার?

নূরী কিছু বলার পূর্বেই উধাও হলো বনহুর।

দরজা খুলে গেলো, কক্ষে প্রবেশ করলো চম্পা।

তার পিছনে সেই বৃদ্ধা, হাতে তার জ্বলন্ত মশাল।

চম্পা বৃদ্ধার হাত থেকে মশালটা নিয়ে গুঁজে রাখে পাশের দেয়ালের ফাঁকে, তারপর বলে—মাইদি, তুমি এবার যেতে পারো।

বৃদ্ধা চম্পাকে অভিবাদন করে বেরিয়ে যায়।

চম্পা এগিয়ে যায় নূরীর বিছানার পাশে। নূরীর নাম ধরে ডাকে।

নূরী উত্তর দেয়—চম্পাদি এসেছো?

হাঁ বোন এসেছি। চম্পা বসলো নূরীর বিছানার পাশে।

নূরী ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে।

চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো নূরী। আজ তার মুখখানাকে ভিন্নরূপ লাগলো তার কাছে—বড় করুণ, বিষণ্ণ মনে হলো।

নূরী বললো—এ ক'দিন কোথায় ছিলে চম্পাদি?

সে কথা নাই বা শুনলে! একটু থেমে বললো চম্পা— নূরী, আমাকে অনেক দূরে যেতে হচ্ছে, বহুদূরে—হয়তো আর তোমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। তাই একটা কথা বলতে এলাম। নূরী, আমার লোক তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার প্রিয়ের কাছে। আর তোমাকে কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না।

নূরী বলে উঠে—তোমার গল্প যে শেষ হয়নি চম্পাদি?

নূরীর কথায় চম্পার মুখোভাব গম্ভীর হয়ে পড়লো, কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো—হাঁ, আজ তোমাকে গল্পটার শেষ অংশ শোনাবো।

খুশী হয় নূরী, বলে সে— বলো?

চম্পা বলতে শুরু করে—হীন্দরাজ কন্যা চন্দ্রা সিন্দরাজ পুত্র জয়রাজকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু চন্দ্রা জানতো তাকে সে কোনোদিনই পাবে না—তবু চন্দ্রা তাকে চিরকাল ভালবাসবে... একটু আনমনা হয়ে যায় চম্পা , তার বুকচিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তারপর আবার বলতে শুরু করে—চন্দ্রা জয়রাজের প্রেমভিখারী নয়, তাকে সে কামনা করেছিলো, সে আশাও তার পূর্ণ হয়েছে। জয়রাজের বুকে মাথা রেখে চন্দ্রা নিজের জীবনকে স্বার্থক করে নিয়েছে। সেইটুকু পাওয়াই যে চন্দ্রার জীবনে চরম পাওয়া...... নূরী আমার গল্প শেষ হলো।

নূরী বলে উঠলো—না, তোমার গল্প শেষ হয়নি—বলো সেই চন্দ্রা কে, কোন্ দেশে তার বাড়ী?

খিলখিল করে হেসে উঠে চম্পা—চন্দ্রার পরিচয় জানতে চাও? বড় চালাক মেয়ে তুমি নূরী।

হাঁ, জানতে চাই; আর চালাক মেয়ে আমি— তাও বটে।

যদি বলি সেই চন্দ্রা আমি।

আমি জানি তুমি ছাড়া সে আর কেউ নয়। চম্পাদি, এবার বলো তোমার সে জয়রাজ কে?

জয়রাজ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারবো না।

না. তোমাকে বলতে হবে।

যা বলেছি তার বেশী আমি বলতে পারবো না নূরী, তুমি আমাকে অনুরোধ করো না।

চম্পাদি, তোমার আরও একটি পরিচয় আছে যা তুমি এখনো আমার কাছে গোপন রেখেছো। বলো কে তুমি?

চম্পার হাসি যেন থামতে চায় না এবার।

নূরী বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে, সত্যি বড় অদ্ভুত মেয়ে চম্পা। জংলী মেয়ের বেশে সে এক সম্রাজ্ঞী।

চম্পার মুখে হাতচাপা দেয় নূরী, বলে সে—তুমি না বললেও আমি জানি তুমি কে!

চম্পার মুখের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, বলে—সত্যি তুমি জানো?

হাঁ, জানি— তুমিই আশা....

কিন্তু আশা কে তা জানো?

নূরী কোনো জবাব দিতে পারে না।

চম্পাই বলে উঠে— মনসুর ডাকুর নাম শুনেছো?

হাঁ, তার নাম আমার অতি পরিচিত।

সেই মনসুর ডাকুর কন্যা ইরানী......

তুমি—তুমি ইরানী!

হাঁ নূরী, জানি তুমি আমাকে ঘৃণা করবে কিন্তু ..... না, আর নয়— আমার গল্প শেষ হয়েছে, এবার বিদায়! সঙ্গে সঙ্গে ইরানী মেঝের এক অংশে পা দিয়ে চাপ দেয়, অমনি সমস্ত কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে একরাশ ধোঁয়া। নূরীর চোখের কাছে সব ঘোলাটে লাগে, অল্পক্ষণ পর সমস্ত ধোঁয়া সরে যায় কিন্তু চম্পার দেখা আর পায় না।

নূরী ডাকে— চম্পাদি .... চম্পাদি.....

কেনো জবাব আসে না।

নূরী কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে, কাউকে দেখতে পায় না।

ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে।

❑

বনহুর তার খেজুর পাতার শয্যা ত্যাগ করতেই বিজয়া একখানা কাগজের টুকরা এনে তার হাতে দেয়— তিলক, পড়ে দেখো।

বনহুর বিজয়ার হাত থেকে কাগজের টুকরাখানা হাতে নিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, তারপর বলে— এটা কোথায় পেলে বিজয়া?

চম্পা আমাকে দিয়ে গেছে।

বনহুর চমকে উঠে— চম্পা। কোথায় সে?

এই কাগজের টুকরাখানা দিয়ে সে বললো— এটা বাবুকে দিস্ বোন। একটু থেমে বললো বিজয়া— চম্পাকে আজ বড় বিষণ্ন, মলিন লাগলো, কিছু যেন ঘটেছে ওর।

বনহুর চিঠির টুকরাখানা আবার চোখের সামনে তুলে ধরলো— ওতে লেখা ছিলো মাত্র একটি লাইন।

"বাবু, তোর পুরস্কার দিয়ে গেলাম, সূরজ নদীপারের বাড়ীখানায় আছে, নিস্।"

বিজয়া বলে উঠলো— তিলক, চম্পা লেখাপড়া জানতো?

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে। বললো বনহুর।

এমন সময় মাইদি বুড়ী এসে দাঁড়ায়, হাতে তার এক ঝুড়ি ফলমূল। বনহুর আর বিজয়াকে লক্ষ্য করে বললো— তোরা খেয়ে নে, যেতে হবে।

বিজয়া অবাক কণ্ঠে বললো— কোথায় যেতে হবে বুড়ীমা?

বুড়ী ফোকলা মুখে হাসি টেনে বললো— এ বনের মায়া এবার ত্যাগ করতে হবে তোমাদের। নাও খেয়ে নাও, বাছা, বেশী কথা বলো না।

বনহুর হেসে বলে— আচ্ছা খাচ্ছি। এসো বিজয়া, খেয়ে নাও।

বিজয়া এগিয়ে আসে, বনহুর ঝুড়ি থেকে একটা ফল তুলে নিয়ে বিজয়ার হাতে দেয়, তারপর খেতে শুরু করে সে নিজে।

বৃদ্ধা ততক্ষণে একটা ঝোলার মত থলের মধ্যে কি সব গুটিয়ে তুলতে থাকে।

বিজয়া এটা লক্ষ্য না করলেও বনহুর লক্ষ্য করছিলো আর ফল নিয়ে গোগ্রাসে খাচ্ছিলো। খেতে খেতে মাঝে মাঝে কথা বলছিলো বনহুর বিজয়ার সঙ্গে।

ফল খেতে বনহুর ভালবাসে কাজেই প্রচুর ফল সে খেতো। ছোটবেলা থেকেই এটা তার অভ্যাস। তাই তার স্বাস্থ্যও ছিলো অদ্ভুত সুন্দর। যেন কেউ মুগ্ধ হতো তার অপরূপ সৌন্দর্যে।

শিশুকালের অভ্যাস বনহুর আজও ত্যাগ করতে পারেনি, ফল পেলে সে খুশি হতো খুব। সমস্ত খাবার ত্যাগ করে সে ফল খেতো।

চম্পা এ খবরটা জানতে পেরেছিলো, বনহুরের জন্য তাই সে প্রচুর ফলমূল সংগ্রহ করেছিলো সূরজ দ্বীপের গহন বনের মধ্যেও।

বনহুর ফল খাচ্ছিলো আর সে কথাই ভাবছিলো— তার জন্য চম্পা অনেক পরিশ্রম করেছে। এখনো সে যা করছে তার ঋণ কোনোদিন পরিশোধ করতে পারবে না।

চম্পাই যে আশা আর আশাই যে মনসুর ডাকুর কন্যা ইরানী, এটা আজ সম্পূর্ণ খোলাসা হয়ে গেছে বনহুরের কাছে।

বনহুর আর বিজয়ার খাওয়া হয়ে গেলে বৃদ্ধা এসে বলে— চলো এবার তোমরা।

বনহুর আর বিজয়া অনুসরণ করে বৃদ্ধাকে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই তারা দেখতে পায় তিনটা অশ্ব দাঁড়িয়ে আছে। একটি ধবধবে সাদা, আর দুটি কালো।

বৃদ্ধা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— এই অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসো, অনেক দূর যেতে হবে।

বৃদ্ধা কথাটা বলে নিজে একটা অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো। বনহুর বিজয়াকে লক্ষ্য করে বললো— অশ্বপৃষ্ঠে চাপতে পারবে বিজয়া?

বিজয়া রাজার মেয়ে, মাঝে মাঝে সে অশ্বপৃষ্ঠে শহর ভ্রমণে বের হতো, তাই কিছুটা অভ্যাস ছিলো।

বনহুরের সহায়তায় সে একটি অশ্বে চেপে বসলো।

বনহুরের জন্য রইলো সাদা অশ্বটা।

এবার বনহুর সাদা অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসতেই বৃদ্ধা নিজ অশ্বে কষাঘাত করলো।

বৃদ্ধার অশ্বচালনা দেখে বনহুর অবাক না হয়ে পারলো না। দক্ষ অশ্বচালকের মতই সে অশ্ব চালিয়ে চলেছে।

বনহুর আর বিজয়ার অশ্ব পাশাপাশি চলেছে। বিজয়া তেমন অশ্ব চালনায় পারদর্শী নয়, তাই বনহুর তাকে ছেড়ে যেতে পারে না।

বৃদ্ধা কিছুদূর এগিয়ে আবার থেমে পড়ে।

বনহুর আর বিজয়া পৌছলে পুনরায় সে অশ্ববেগ বাড়িয়ে দেয়।

বেশ কিছু সময় চলার পর তারা নদীতীরে এসে পৌছলো।

একখানা বজরা অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্য। বৃদ্ধা ইংগিত করতেই বজরা নিয়ে মাঝিরা এগিয়ে এলো।

বৃদ্ধা এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— এই বজরায় চেপে ওপারে যেতে হবে।

বনহুর বিজয়াসহ বজরায় উঠে পড়লো।

মাঝিরা বজরা ছাড়লো।

বজরার ছাদে গিয়ে বসলো বনহুর।

বিজয়াও বজরার ছাদে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো— বসো বিজয়া।

বিজয়া বসলো বনহুরের পাশে।

বজরা ভেসে চলেছে।

বিজয়া বললো— সত্যি, এত সুন্দর বজরা এই গহন বনের মধ্যে নদীবক্ষে দেখতে পাবো ভাবতে পারিনি। এ বজরা এলো কোথা থেকে তিলক বলতে পারো?

হাঁ পারি— এ সবই চম্পার কৃতিত্ব। বিজয়া, চম্পা এ বনের রাণী।

ওকে দেখলে কিন্তু তেমন মনে হয় না। অথচ ওর মধ্যে এত গুণ আছে! কে জানতো সে লেখাপড়া জানে! আচ্ছা তিলক, সে তোমাকে কি পুরস্কার দেবে?

বনহুর একটু হেসে বললো— ফুল।

ফুল?

হাঁ।

ফুল নিয়ে কি করবে তিলক?

ফুল আমি ভালবাসি তাই।

চম্পা জানতো বুঝি তুমি ফুল ভালবাসো?

হয়তো জানতো।

বিজয়া আনমনে কিছু ভাবতে থাকে, বোধ হয় চম্পার কথাই ভাবছিলো সে।

নদীর জলরাশির দিকে তাকিয়ে বনহুর বলে—কি সুন্দর জলরাশি, দেখো দেখো বিজয়া কতবড় একটা মাছ। বনহুর বিজয়ার অন্যমনস্ক ভাবটা নষ্ট করার জন্যই কথাটা বলে।

বিজয়া বহু মাছ দেখেছে কিন্তু নদীর জলে মাছকে সাঁতার কাটতে কোনোদিন দেখেনি। খুশি হলো বিজয়া মস্তবড় মাছটা দেখে, বললো— তিলক, ঐ মাছটা ধরা যায় না?

যায়, কিন্তু ধরা বড় কষ্টকর।

বুঝেছি গভীর জলের মাছ ওটা, তাই তাকে ধরা মুস্কিল।

হাঁ।

যেমন তুমি।

বনহুর বিজয়ার দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকায়, অবাক হবার ভান করে বলে— তার মানে?

বিজয়া একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বলে— তিলক, সে তুমি বুঝবে না।

বনহুর মৃদু হেসে বলে— তোমাদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বুঝা সবার পক্ষে সহজ নয়। বিজয়া, আজ একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, অবশ্য তুমি সত্য কথা বলবে কিনা সন্দেহ।

তিলক, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

করি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে করি না, কারণ মেয়েদের লজ্জা তাদের কণ্ঠ রোধ করে দেয়। সব সময় তারা সহজ-সরলভাবে সব কথা বলতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করো, আমি বলবো।

বলবে?

হাঁ।

বিজয়া, আমি জানি তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছো, যদিও আমার সম্বন্ধে সব জানো তবুও তুমি এ ভুলটা করে বসেছো। কিন্তু এবার তোমার ভুল ভাঙতে হবে, বিদায় দিতে হবে আমাকে।

তিলক!

জানি আমাকে বিদায় দিতে তোমার খুব কষ্ট হবে, তবুও যেতে হবে আমাকে....... একটু থেমে আবার বললো বনহুর— বিজয়া, তুমি কি চাও, কি পেলে সুখী হবে বলো?

বিজয়ার মুখ রাঙা হয়ে উঠে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে নদীর দিকে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবে কিছু তারপর বলে— আমি যা চেয়েছিলাম তা পাবো না কোনোদিন জানি তবু তোমার কাছে একটা অনুরোধ, রাখবে বলো?

বলেছি রাখবো!

তুমি যেখানেই থাকো আমাকে মনে রেখো। বিজয়া তোমার [illegible] এ কথা কোনোদিন ভুলে যেও না।

বনহুর নির্বিকার চোখে তাকালো বিজয়ার দিকে, তার ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠলো।

বিজয়াও চোখ তুললো কিন্তু বনহুরের দৃষ্টির কাছে সে স্থির থাকতে পারলো না. দ্রুত উঠে চলে গেলো সে বজরার সিঁড়ি বেয়ে নীচে।

বনহুর মৃদু হাসলো।

বিজয়া নীচে নেমে আসতেই বৃদ্ধা মাইদি বুড়ী বললো— খারাপ লাগছে বুঝি?

না বুড়িমা।

তবে এলে কেন?

তোমার কাছে একটু বসবো বলে।

বসো মা, বসো।

বিজয়া বৃদ্ধার পাশে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ নীরবে বসে বসে ভাবে, কি ভাবে সে নিজেই জানে, তারপর বলে— বুড়ী মা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জবাব দেবে তো?

বলো, দেবো মা দেবো।

আচ্ছা বুড়ীমা, তুমি কি জীবনে কাউকে ভালবেসেছিলে?

বিজয়ার কথায় হাসে বুড়ীমা, তারপর বলে— এই কুৎসিত কদাকার মেয়ের ভালবাসা কে নেবে বোন! বেসেছিলাম একজনকে কিন্তু প্রতিদান পাইনি।

বৃদ্ধার কথায় বিজয়ার মনে বিপুল এক জানার বাসনা জাগে, আগ্রহভরা কণ্ঠে বলে— তোমার সে কাহিনী আমাকে শোনাবে বুড়ীমা?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বৃদ্ধা, তারপর বলে— সে কাহিনী বড় করুণ। বৃদ্ধার কথাটা যেন তার বুকের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসে। একটু থেমে বলতে শুরু করে— আমার বাবা ছিলো মস্তবড় শিকারী। বনে বনে শিকার করে বেড়ানো ছিল তার নেশা। আমি কিন্তু সব সময় আমার বাবার সঙ্গে থাকতাম। কুৎসিত ছিলো আমার চেহারা তাই কোনো পুরুষ

আমাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলো না। আমার বাবা জংলী সর্দার, অনেক জংলী যুবককে বাবা আমাকে বিয়ে করতে বলতো, এমন কি ভয়ও দেখাতো কিন্তু কেউ তবু রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত বাপ-মা আমার বিয়ের কথাই ভুলেই গেলো। বয়স তো আর বসে রইলো না, বেড়েই চললো। দিন যায়— মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠলো, একজন সাথীর জন্য ছটফট করতে লাগলো আমার হৃদয়। তখন একদিন একটা মস্তবড় বাঘ শিকার করলো আমার বাবা, নিয়ে গেলো শহরে। আমি ও গেলাম তার সঙ্গে। বহুলোক বাবা আর বাঘটাকে ঘিরে দেখতে লাগলো। এক একজন অবাক হয়ে গেছে বাঘটাকে দেখে কারণ এতবড় বাঘ সহসা দেখা যায় না। বেশ কয়েক দণ্ড পর ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো এক বাবু। বাবার কাছে বাঘটার দাম করতে লাগলো। বাবা যা দাম চাইলো তাই দিয়ে বাঘটাকে নিয়ে গেলো বাবুটা। কিন্তু বাঘটার সঙ্গে বাবু আমার মনটাকে চুরি করে নিয়ে গেলো। বাবু আমার দিকে ফিরেও চাইলো না অথচ আমি বাবুকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললাম। তারপর থেকে আমি বাবুকে খুঁজে ফিরতে লাগলাম শহরের নানা জায়গায়। একদিন এক বাড়ীর সামনে দেখলাম সেই বাবুকে। মস্তবড় বাড়ী। গাড়ীতে চেপে চলে গেলো কোথায়। আমি পথের একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। একসময় ফিরে গেলাম সেখান থেকে। বাবা শহর ছেড়ে চলে গেলো। আমি পালিয়ে থাকলাম। রোজ ঐ পথের ধারে গিয়ে দাঁড়াতাম বাবুকে একনজর দেখতে পাবো বলে। বাবু গাড়ীতে চেপে রোজ আমার পাশ কেটে চলে যেতো কিন্তু একবারও সে ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখতো না। তবু আমি তাকে একনজর দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। একদিন বাবু যখন গাড়ীতে উঠতে যাবে ঠিক তখন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম বাবুর পাশে। বাবু আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আমি ডাকলাম— বাবু! বাবু এবার তাকালো আমার দিকে, পকেট থেকে একটা টাকা বের করে আমার হাতে দিতে গেলো— আমি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললাম— বাবু

আমি ভিখারী নই। বাবু বললো— কি চাও আমার কাছে? আমি [illegible] সাহস টেনে বললাম— বাবু তোকে ভালবাসি.... আমার কথা শেষ হলো না, সঙ্গে সঙ্গে বাবু আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলো। আমি পড়ে গেলাম মাটিতে। পাথরের সিঁড়িতে মাথা ঠুকে কেটে গেলো, রক্তে সিঁড়ির ধাপ লালে লাল হয়ে উঠলো। বাবু ততক্ষণে গাড়ীতে চেপে চলে গেছে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম, মাথার রক্তে জামা—কাপড় ভিজে পা দু'খানা আমার রাঙা হয়ে উঠলো। আমার চোখে প্রতি হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো, আমি ফিরে এলাম আমার বাসস্থানে। কিন্তু সেই অদম্য ভালবাসার পরিবর্তে সেদিন আমার মনে ভীষণ ক্রোধের সৃষ্টি হলো। সমস্ত রাত ধরে আমি না ঘুমিয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। রাত ভোর হলো। একটা মতলব জাগলো আমার মনে, আমি আমার তীর-ধনুটা তুলে নিলাম হাতে। এক সময় এসে দাঁড়ালাম সেই জায়গায়, যে জায়গা থেকে রোজ আমি তাকে দেখতাম। আজ পূর্বের সে দৃষ্টি নিয়ে আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, আজ আমার চোখে হত্যার নেশা। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম কখন বের হবে সে। অন্যান্য দিন হৃদয়ে জাগতো এক বিপুল উন্মাদনা— আজ সেই উন্মাদনা নেই, আছে এক দানবীয় হিংস্র মনোভাব। আমার আশা পূর্ণ হলো, প্রতিদিনের মত বেরিয়ে এলো সে। ঐ দণ্ডে আমি ধনুকে তীর জুড়লাম—মাত্র এক পলক, বাবু গড়িয়ে পড়লো মাটিতে ......এবার থামলো বৃদ্ধা, তার চোখেমুখে একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো, একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিয়ে বলতে শুরু করলো আবার— বাবু মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম। আর কোনোদিন সেদিকে যাইনি। তারপর চল্লিশ বছর কেটে গেছে, কাউকে আর ভালবাসতে পারিনি..... থামলো বৃদ্ধা, মন তার চলে গেছে সেই হারানো চল্লিশ বছর আগের দিনে।

হঠাৎ মাঝি এসে বললো— মাইদি, ঘাট আইছে।

সম্বিৎ ফিরে পেলো বৃদ্ধা।

বিজয়াও যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলো, মাঝির ডাকে তার ও চমক ভাঙ্গে।

বৃদ্ধা বলে— এবার চলো, তোমাদের নামতে হবে।

বিজয়া পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো বনহুর এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পিছনে।

বৃদ্ধা বনহুর আর বিজয়াসহ নেমে পড়লো ডাঙ্গায়।

দু'জন লোক তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

একজন যুবক, একজন বয়স্ক।

বৃদ্ধা বললো— অশ্ব এনেছো?

লোক দু'জনার মধ্যে একজন বললো— হাঁ, এনেছি।

কোথায় রেখেছো?

ঐ যে গাছটার নীচে।

বনহুর আর বিজয়াসহ বৃদ্ধা অদূরস্থ একটি অশত্থ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো, দেখলো তিনটা অশ্ব দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বৃদ্ধার কথায় বনহুর আর বিজয়া অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

বৃদ্ধা তৃতীয়টিতে চাপলো।

বিজয়া অশ্বপৃষ্ঠে চেপে তাকালো বনহুরের দিকে, মনে তার ভয় জাগছিলো হঠাৎ কোনো বিপদ এসে না পড়ে।

বনহুর বুঝতে পারলো বিজয়া ভয় পেয়েছে, তাই সে হেসে বললো— আমি আছি।

বিজয়ার মনটা সাহসে ভরে উঠলো। খুশীতে দীপ্ত হলো তার মুখমণ্ডল। তাইতো, তার ভয় পাবার কি আছে, তিলক যদি পাশে থাকে সব ভয় দূর হয়ে যায়।

অশ্বগুলো ছুটতে শুরু করে।

বিজয়া দেখতে পায় তাদের কিছুটা দূরে আরও দুটি অশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারে তারা অন্য কেউ নয়, সেই লোক দুটি যারা তাদের নদীতীরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো।

এক সময় তারা সেই বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীখানায় পৌছে যায়।

বিজয়া অবাক না হয়ে পারে না। গহন বনের মধ্যে নির্জন স্থানে এমন সুন্দর বাড়ী দেখবে সে ভাবতে পারেনি।

বিজয়া মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

বনহুর আর বিজয়াকে নিয়ে বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করে বৃদ্ধা।

চম্পার পুরস্কার দেখার জন্য বিজয়ার মনে বিপুল বাসনা জাগে। তিলক বলেছে তাকে চম্পা ফুল পুরস্কার দেবে। ফুল— না জানি কি ফুল, সে ফুল কে জানে!

বনহুর আর বিজয়াকে একটি কক্ষে এনে বসায় বৃদ্ধা, তারপর বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বলে যায় সে— এবার তোমার পুরস্কার আনছি।

বিজয়ার দিকে তাকায় বনহুর।

ওর মুখে হাসির আভাস—ফুল সেও ভালবাসে, তিলক পেলে তাকেও দেবে নিশ্চয়ই। বিজয়া বললো— তিলক, তোমার পুরস্কার আমাকে দেবে না?

বনহুর বললো— দেবো!

সত্যি?

হাঁ, যদি নাও!

নিশ্চয়ই নেবো, ফুল যে আমিও ভালবাসি।

এমন সময় বৃদ্ধার সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে সেটা গোমটা ঢাকা চম্পার বান্ধবী।

বিজয়া প্রথমে অবাক হয়।

বৃদ্ধা হেসে বলে— বাবু, এই নাও পুরস্কার।

মুহূর্তে বিজয়ার মুখ গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়লো। বিস্ময় নিয়ে তাকালো সে ঘোমটা-ঢাকা তরুণীর দিকে।

বৃদ্ধা তরুণীর হাতখানা বনহুরের হাতে তুলে দিয়ে বললো— নাও।

বনহুর যত্ন সহকারে সুন্দর ফুলের মত হাতখানা নিজের মুঠায় চেপে ধরলো, তারপর সে তরুণীর ঘোমটা সরিয়ে ফেললো দ্রুত হাতে।

নূরী আর বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো মাত্র।

বিজয়া বলে উঠলো— তিলক, এই কি তোমার ফুল?

বনহুর বৃদ্ধাকে বলো— এর নাম কি বুড়ীমা?

বৃদ্ধা বললো— এরই নাম ফুল।

বিজয়া বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো, সত্যি ফুলের মতই সুন্দর মেয়েটি।

বৃদ্ধা এবার বললো— তোমার পুরস্কার পেয়ে গেছো, এবার তোমরা বিদায় নাও। বৃদ্ধা হাতে তালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবক এসে দাঁড়ালো, যে যুবকটি নদীতীরে অপর একজনের সঙ্গে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। বৃদ্ধার সম্মুখে নতমুখে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধা বললো— এদের নিয়ে যাও এবার।

বনহুরের দিকে লক্ষ্য করে বললো যুবকটি— এসো তোমরা। আমার সঙ্গে.....বনহুর আর বিজয়া যুবকের অনুসরণ করলো। নূরীও অনুসরণ করলো তাদের।

বিজয়া বললো— তুমি আবার কোথায় যাবে?

নূরী কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বনহুর বললো— বিজয়া, উপহারের জিনিসে অবহেলা করতে নেই।

ওকে নিয়ে কি করবে তুমি?

কোনো উপকারে আসতে পারে।

বনহুরের কথা শুনে হাসে নূরী?

বিজয়া গম্ভীর হয়ে পথ চলতে শুরু করে। বিজয়া জানে না এই সেই নূরী, যাকে তিলক খুঁজে চলেছিলো কতদিন ধরে।

যুবকটি এগিয়ে চলেছে, তাকে অনুসরণ করছে বনহুর, বিজয়া আর নূরী।

বহুক্ষণ পথ চলার পর তারা একটা শব্দ শুনতে গেলো, থমকে দাঁড়ালো বনহুর ও বিজয়া, নূরীও দাঁড়িয়ে পড়লো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো বিজয়া— ও কিসের শব্দ?

বনহুর কান পেতে শুনছিলো, এবার সে বললো সমুদ্রের গর্জন শোনা মনের হচ্ছে।

বনহুরদের সঙ্গে যুবকটিও থেমে পড়েছিলো, তাকে বললো বনহুর নিকটে বুঝি সমুদ্র আছে?

হাঁ, তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি!

বিজয়া বললো— কেন? আমাদের সমুদ্রের দিকে কেন নিয়ে যাচ্ছো?

যুবকটি কিছু বলার আগেই বললো বনহুর—আমাদের জন্য সেখানে জাহাজ প্রতীক্ষা করছে।

বনহুরের কথায় চমকে উঠলো যুবকটি, যদিও তাকে কেউ লক্ষ্য করছিলো না তখন। বনহুরের দৃষ্টি ছিলো কিন্তু ওর দিকে, কথাটা বলে আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখে নিলো একবার।

বিজয়া বলে উঠলো— জাহাজ?

হাঁ বিজয়া, চম্পা আমাদের জন্য সেখানে জাহাজের ব্যবস্থা করেছে। এবার আমরা এই সূরজ বন ত্যাগ করবো।

বিজয়া খুশী হয়ে বললো— সত্যি বলছো তিলক?

হাঁ সত্যি, এবার তোমার বাবা-মার কাছে তোমাকে পৌছে দিতে সক্ষম হবো বলে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

বিজয়া বললো— তুমি তো আমাদের ত্যাগ করতে পারলে বেঁচে যাও...

আরো হয়তো কিছু বলতো বিজয়া, নূরীর দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

বনহুর আর অন্যান্য সবাইকে অবাক করে দিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় মাইদি বুড়ী। একমুখ হেসে বলে— এলাম বিদায় দিতে।

বিজয়া আর বনহুর অবাক না হয়ে পারে না, বৃদ্ধা তাহলে আমাদের অনুসরণ করে এসেছে।

বনহুরদের পথ দেখিয়ে এবার নিয়ে চললো বৃদ্ধা।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই অবাক হলো সবাই— যুবকটি কোথায় উধাও হয়েছে।

বিজয়া বললো— ও লোকটি গেলো কোথায়?

বনহুর হেসে বললো— হয়তো জাহাজে চলে গেছে।

বৃদ্ধা বনহুরের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে পুনরায় চলতে শুরু করলো।

❑

জাহাজে পৌঁছে বনহুর দেখলো সেটা সম্পূর্ণ একটি মালবাহী জাহাজ। কয়েকজন খালাসী আর জাহাজের চালক ছাড়া আর কেউ নেই। আরও আশ্চর্য হলো বনহুরের দল, কারণ সেই যুবকটিকে তারা জাহাজে দেখতে পেলো। বনহুর অবশ্য আশ্চর্য হয়নি, সে পূর্বেই বলেছিলো তাকে আমরা জাহাজে পাবো।

সেই যুবকটিই বনহুর ও তার সঙ্গীদের জাহাজে অভ্যর্থনা জানালো।

বৃদ্ধা এবার বিদায় নিলো তাদের কাছে।

এটাই বৃদ্ধার শেষ বিদায়।

বনহুর আর বিজয়ার মাথায় হাত রেখে বৃদ্ধা আর্শীবাদ করলো। আর্শীবাদ করলো সে নূরীকেও।

নূরী কিন্তু বিজয়ার সম্মুখে বেশ জড়োসড়ো হয়েই রইলো, স্বামীকে পাশে পেয়েও সে নিশ্চুপ রইলো বোবার মত, যদিও তার মনে কত কথা উদয় হচ্ছিলো। বারবার ইচ্ছা হচ্ছিলো তার, বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, হুর, এতদিন এমনি করে কোথায় ছিলে তুমি? কেন তুমি দেখা দাওনি আমাকে?

তোমাকে ছেড়ে কত কষ্টে ছিলাম আমি, তুমি জানো না আমার মনের ব্যথা......

হয়তো বনহুরের মনেও এমনি কত কথা জাগছিলো— কাজের ফাঁকে ফাঁকে নূরীর মুখখানা তুলে ধরে হয়তো একটা চুম্বনরেখা এঁকে দিতো তার

রক্তরাঙা ওষ্ঠদ্বয়ে কিন্তু নিজকে সংযত করে রেখেছিলো [illegible] খুব সাবধানে। নূরী যেন একজন সত্যি সত্যি অপরিচিতা জন। বিশেষ করে বিজয়ার সম্মুখে তারা উভয়ে উভয়কে এড়িয়ে চলতে লাগলো।

বিজয়া কিন্তু সব সময় বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে রইলো, বনহুর যেন ওর সঙ্গে মেশার সুযোগ না পায়।

নূরী ইচ্ছা করেই দূরে দূরে রইলো, অবশ্য দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যেই তাদের মনের কথাবার্তা চলছিলো।

জাহাজে উঠার আগে বুড়ীমা বনহুরকে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললো— তুই আমার জান বাঁচিয়েছিলি, সেজন্য আমি তোকে এটা দিলাম, কিন্তু এটা তিন মাসের আগে খুলবি না।

বনহুর হাসিমুখে মোড়কটা গ্রহণ করেছিলো।

তারপর জাহাজে এসে বনহুর হাত নেড়ে বিদায় নিলো বৃদ্ধার কাছে।

বিজয়া, নূরী এরাও হাত নাড়তে লাগলো।

বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে রইলো তীরে।

জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে সরে যেতে লাগলো অন্তরালে।

বনহুর জাহাজটাকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো, তার সঙ্গে রইলো সেই যুবকটি।

বৃদ্ধা বিদায়কালে বলেছিলো, এর নাম মাংতু, খুব ভাল ছেলে। মাংতু তোমাদের সঙ্গে থাকবে। ও থাকতে তোমাদের কেনো অসুবিধা হবে না।

বনহুর শুধু মাথা দুলিয়ে বৃদ্ধার কথাগুলো শুনছিলো।

এখন মাংতু বনহুরকে সঙ্গে করে সব দেখাচ্ছিলো।

বনহুর জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো একটি যুদ্ধ জাহাজে যা যা দরকার সব আছে তার মধ্যে। বাইরে থেকে মালবাহী জাহাজ মনে হলেও ভিতরে অস্ত্র বোঝাই। জাহাজের খোলসের ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় বনহুর কয়েকটা বড় বড় কামান বসানো রয়েছে। কামানের মুখগুলো এমনভাবে বাইরে বেরিয়ে আছে যা বাইরে থেকে একটুও বুঝা যায় না।

জাহাজের চারপাশে মেশিনগান বসানো আছে। যেদিকে যখন প্রয়োজন সেদিক থেকেই সেগুলো ব্যবহার করা হবে। জাহাজের একস্থানে অনেকগুলো রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। একপাশে গোলা-বারুদের স্তূপ।

এবার জাহাজের পিছন অংশে বনহুরকে নিয়ে গেলো মাংতু।

বনহুর খুশি হলো দেখে, এ অংশে কতগুলো মূল্যবান মেসিন ও যন্ত্রপাতি রয়েছে। ওয়্যারলেস মেসিন, টেলিভিশন, চুম্বকযন্ত্র— যা বহুদূরের কোনো জাহাজকে আকর্ষণ করে, চুম্বক বাইনোকুলার— এ মেসিনে হাজার হাজার মাইল দূরের বস্তু নিকটে মনে হয়। এ ছাড়া মিটার ডিনামাইট, রকেট বোমা, হাতবোমা আরও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র। যা দূর থেকে শত্রুদের ধ্বংস করা যায়, এরকম অনেক অস্ত্র রয়েছে। বনহুর সব দেখে নিলো ভালভাবে।

এবার বনহুর মাংতুকে বললো— যা প্রয়োজন সব রয়েছে দেখলাম। পারবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে?

মাংতু পাগড়ীটা ঠিক করে নিয়ে মাথা দোলালো।

বনহুর ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো— সাবাস!

এবার মাংতুসহ ফিরে এলো বনহুর বিজয়া আর নূরীর পাশে। এতক্ষণ গোটা জাহাজখানা ঘুরেফিরে দেখতে বেশ ঘেমে উঠেছে বনহুর, তার সুন্দর মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই বিজয়া এগিয়ে এলো বললো সে— বড্ড ঘেমে গেছো তিলক!

হাঁ! কথাটা বলে সে হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছতে গেলো।

বিজয়া আঁচল হাতে বললো— আমি মুছেদি।

থাক, হয়ে গেছে।

বিজয়া তবু শুনলো না, সে আঁচল দিয়ে বনহুরের মুখমণ্ডল মুছে দিয়ে বললো— বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছো! বসো আমি হাওয়া করি। বিজয়া আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো।

বনহুর বাধা দিলো না ওকে, শুধু নূরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো মাত্র।

নূরীর ইচ্ছা হচ্ছিলো একবার স্বামীর বুকে মাথা রেখে কিছু বলে, কিন্তু অতি কষ্টে সে মনকে শক্ত করে রেখেছিলো। তবু একটু ফাঁক খুঁজছিলো যে মুহূর্তে সে স্বামীকে এতটুকু কাছে পাবে।

জাহাজ তখন চলেছে।

মাংতু তাদের বিশ্রামের জন্য ক্যাবিন দেখিয়ে দিলো, এক ক্যাবিনেই থাকবে ওরা।

ওদের বিশ্রাম ক্যাবিনে পৌছে দিয়ে মাংতু চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর এক খালাসীর হাতে রাশিকৃত খাবার নিয়ে ফিরে এলো। বহুদিন এসব খাবার খেতে পায়নি তারা, সবাই খাবার পেয়ে খুশী হলো। সবচেয়ে বেশী খুশি হয়েছে বিজয়া, কারণ সে রাজার মেয়ে, রাজ-খাবার খেয়ে তার অভ্যাস। বনহুর আর নূরীর তেমন অসুবিধা হয়নি, কারণ তারা শিশুকাল হতেই জঙ্গলে বাস করেছে; জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে বড় হয়েছে তবু তারাও খেতে বসে অনেক তৃপ্তি অনুভব করলো। আজ যে খাবার তারা পেয়েছে সে খাবারের মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস আর দুধ।

তৃপ্তি সহকারে খাবার খেলো বনহুর, বিজয়া আর নূরী। একই টেবিলে ওরা খাচ্ছিলো।

মাংতু টেবিলে খাবার রেখে চলে গিয়েছিলো।

বনহুর খাচ্ছিলো এবং পরিবেশন করছিলো।

বিজয়া বনহুরের পাশে বসেছিলো। নূরী ছিলো কিছুটা দূরে।

নূরী লক্ষ্য করছিলো বনহুর মাছ খাচ্ছে না, কারণ সে জানে, বনহুর মাছ খেতে ভালবাসে কিন্তু কাঁটা বেছে খেতে পারে না। অনেকদিন নূরী পাশে বসে ওর মাছের কাঁটা বেছে দিয়েছে, তবেই মাছ খেয়েছে বনহুর। আজ বনহুর মাছ খাচ্ছে না দেখে মনটা ওর বড় খারাপ হয়ে গেলো। সেও মাছগুলো নিজের পাত থেকে উঠিয়ে রাখলো।

বিজয়া লক্ষ্য না করলেও বনহুর লক্ষ্য করলো। সে পুনরায় মাছগুলো পাতে তুলে নিয়ে কাঁটাসহ মুখে দিতে গেলো। এবার নূরী নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, সে দ্রুত চেয়ার ত্যাগ করে বনহুরের পাশে এসে হাত চেপে ধরলো কিন্তু মুখে সে কিছু বললো না।

বিজয়া আশ্চর্য হয়ে বললো— একি, ও তোমাকে মাছ খেতে দেবে না বুঝি?

বনহুর বললো— হয়তো এ মাছগুলো ও খেতে চায়। বেশ, নিয়ে যাও ফুল।

বিজয়া কোনো কথা না বলে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। সে ভাবে, ওর এত সাহস তিলকের খাবার মাছ ও নিতে চায়! বিজয়া রাগতভাবে ওকে ধাক্কা দেয়— যাও।

নূরী পড়ে যাচ্ছিলো বনহুর ওকে ধরে ফেলে।

ক্ষণিকের জন্য নূরী স্বামীর বুকে আশ্রয় নেয়, মন তার অপূর্ব এক অনুভূতিতে শিউরে উঠে। সহসা সরে যায় না নূরী স্বামীর বাহু থেকে।

বিজয়ার রাগ আরও বেড়ে যায়, বলে সে— তিলক, একি করছো, ছেড়ে দাও ওকে।

বনহুর একটু হেসে নূরীকে মুক্ত করে দেয়।

নূরী চলে যায় নিজের আসনে।

বিজয়া গম্ভীর মুখে খেতে থাকে। তিলক ওকে ধরে ফেলায় মনে মনে খুব ক্রুদ্ধ হয় সে।

নীরবে খাওয়া শেষ করে বনহুর। মাছ খাওয়া তার হয় না। নূরীও মাছ খায় না, কতদিন পর মাছ পেয়েছিলো বনহুর কিন্তু সে খেতে পারবে না, নূরী খাবে কি করে!

খাওয়া শেষ করেই বনহুর ছুটলো জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে। জাহাজ এখন কোন্ দিকে কোন্ পথে চলেছে জানা তার একান্ত দরকার।

বনহুর ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনের প্রবেশ করে দেখতে পেলো মিশকালো এক নিগ্রো একটি ম্যাপ খুলে তন্ময় হয়ে দেখছে। বনহুর লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালো, ঝুকে দেখে নিয়ে আচমকা তার কাঁধে হাত রাখলো।

লোকটা চমকে উঠলো না বা চট করে ফিরে তাকালো না।

বনহুর বললো— ক্যাপ্টেন, এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছো"

এবার লোকটা ম্যাপ থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে বনহুরের মুখে তাকালো. বললো— জাহাজখানা কোন্ পথে চলেছে তাই দেখছি।

কোন্ পথে এবং কোথায় যাচ্ছে এখনও আমার জানা হয়নি। তাছাড়া আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও হয়নি এখন পর্যন্ত।

বনহুর এটুকু বলতেই লোকটা বলে উঠলো— তোমার সম্বন্ধে আমার জানার কোনো উৎসাহ নেই। আমার পরিচয় দিচ্ছি, আমার নাম ফাংহু লং। আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন।

আমি বুঝতে পেরেছি। তবে হাঁ, এই জাহাজে যখন আমি আছি তখন আমার সম্বন্ধে তোমার জানা একান্ত দরকার। অবশ্য মাংতুর কাছে আমার সম্বন্ধে সব জেনে নিয়েছো তবুও জেনে রাখো, আমি তোমার বন্ধুজন, তোমাকে আমি তোমার কাজে সাহায্য করতে পারি।

লোকটার জমকালো মুখে একটু হাসি ফুঠে উঠলো, দাঁতগুলো ঠিক যেন গাঢ় মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো একটুখানি, বললো— পারবে আমাকে সাহায্য করতে?

বনহুর বললো— পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

বেশ। বললো— বললো ফাংহু লং।

বনহুর বসলো তার পাশে, ম্যাপখানার উপরে ঝুকে পড়ে বললো— এ ম্যাপখানা দেখছি......

বনহুরের কথা শেষ হয় না, ফাংহু বলে উঠে— এটা হলো নীল নদের বিভিন্ন প্রবেশপথের ম্যাপ। এই যে রেখাগুলো দেখছো এ গুলো নীল নদ থেকে যে সব মোহনা অন্যান্য সাগরে বা নদীতে এসে যোগ হয়েছে সেগুলো।

আমরা এখন কোন্ পথ হয়ে কোন্‌দিকে চলেছি বলবে কি?

নিশ্চয়ই বলবো। ম্যাপের একটি মোটা রেখার উপরে আংগুল দিয়ে লম্বা লম্বি দেখিয়ে বললো— এখন আমরা এই পথ ধরে চলেছি। নীল নদ অতিক্রম করে হীরা পর্বতের পাশ কেটে ফারহা নদের মোহনা দিয়ে বেরিয়ে আবার আমরা নীল নদে এসে পড়বো। নীলনদ হয়ে নীল দ্বীপে পৌছবো।

বনহুর ভ্রুকুঁচকে শুনছিলো ফাংহুর কথাগুলো। এবার সে বলে উঠলো— এত ঘুরে যাবার কি দরকার ছিলো ফাংহু লং, জংঙ্গী নদের প্রবেশপথ তো অতি সহজ পথ।

ফাংহু বললো— ও পথে যাওয়া আমাদের মোটেই সমীচীন হবে না।

কারণ?

কারণ জানতে চাও তুমি?

ফাংহুর কথায় বললো বনহুর— হাঁ।

তবে এসো আমার সঙ্গে। ফাংহু ম্যাপখানা ভাঁজ করে রেখে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বনহুর অনুসরণ করলো তাকে।

মেসিনাদির ক্যাবিনে প্রবেশ করে এক পাশের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালো ফাংহু।

বনহুর তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ফাংহু এবার ক্যাবিনের দেয়ালে একটি সুঁইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিন জমাট অন্ধকারে ভরে উঠলো। পরক্ষণেই জ্বলে উঠলো টেলিভিশনের বাল্বের নীল আলো। বনহুর তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের পর্দায়। পর্দা কাঁপছে .....তারপর ফুটে উঠলো সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের দোলায় দুলছে একটি জাহাজ, পরপর আরও দুটি জাহাজ দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

ফাংহু বললো— দেখেছো জঙ্গী নদের প্রবেশপথে পুলিশ জাহাজ কড়া পাহারা দিচ্ছে। আমাদের জাহাজ এ পথে এগুলেই ওরা আমাদের পাকড়াও করে ফেলবে।

বনহুর তখনও স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের পর্দায়। তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে সে ভাল করে জাহাজগুলোকে। অস্পষ্ট দেখা গেলেও বনহুরের চোখে ধরা পড়লো— প্রত্যেকটা জাহাজের ভিতরে রয়েছে পুলিশ ফোর্স।

ফাংহু বললো— আমরা চাই এই জাহাজগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে নীলনদ অতিক্রম করে বাইরে যেতে।

বনহুর তখনও স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে টেলিভিশনের পর্দায়— শুধু জাহাজগুলোই সে লক্ষ্য করছে না, লক্ষ্য করছে জাহাজগুলোর আশেপাশে জলরাশি। সে বুঝতে পারে, চুম্বক টেলিভিশন দ্বারা হাজার হাজার মাইল দূরের দৃশ্য এই টেলিভিশনের পর্দায় টেনে নেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ ভালভাবে দেখে নিয়ে হঠাৎ তার স্বভাবমত হেসে উঠে— হাঃ হাঃ হাঃ ...অদ্ভুত সে হাসির শব্দ।

চমকে উঠে ফাংহু লং, বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর হাসি বন্ধ করে বলে উঠে— ফাংহু, তুমি চাও এই জাহাজগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে নীলনদ অতিক্রম করতে কিন্তু আমি চাই এদের সম্মুখে দিয়ে বেরিয়ে যেতে।

অবাক হয়ে ফাংহু বনহুরের কথাগুলো শুনলো, তারপর বলে উঠলো— তুমি কি পাগল, পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করার জন্য সমুদ্রবক্ষে টহল দিচ্ছে আর আমরা যাবো তাদের সম্মুখ দিয়ে? এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বনহুর এবার বলে উঠলো— ফাংহু, চোরের মত পালানোর চেয়ে বীরের মত গ্রেফতার হওয়া অনেক শ্রেয়। পুলিশ বাহিনীর সম্মুখ দিয়েই আমরা যেতে চাই ফাংহু। কথাটা বলে বেরিয়ে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই দেখতে পায় মাংভু দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছনে। বনহুরকে দেখে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দেয় মাংভু।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নিজের ক্যাবিনে এসে বসে ভাবতে থাকে কিছু।

বিজয়া আর নূরী তখন আপন মনে গল্প করছিলো। বনহুর খুশী হলো ওদের এই পরিবেশ লক্ষ্য করে। যা হোক, ওদের মধ্যে তবে মিল হয়ে গেছে।

বনহুর এবার গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে।

জাহাজের একটানা ঝকঝক শব্দ তার মনকে অদ্ভুতভাবে চঞ্চল করে তোলে। তার ধমনির রক্ত ক্রমশঃ যেন উষ্ণ হয়ে উঠছে।

এমন সময় ফাংহু তার জমকালো বিরাট বপু নিয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করে, একটু কেশে নিজের উপস্থিতি জানালো সে।

বনহুর বললো— এসো।

ফাংহু বনহুরের পাশে এসে বসলো, দু'জনার মধ্যে এবার গভীরভাবে আলোচনা চললো। ফাংহুর সঙ্গে ইংরেজীতেই কথাবার্তা হচ্ছিলো কারণ ফাংহু ভাল বাংলা বলতে পারে না।

এরপর থেকে বনহুর আর ফাংহুর মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব ভাব জমে উঠলো।

প্রায়ই ওরা একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতো এবং কাজও করতো একসঙ্গে। ফাংহুর চেহারাটা বিদঘুটে হলেও ওর মনটা ছিলো অত্যন্ত ভাল, বনহুর দু'চার দিন ওর সঙ্গে মিশেই বুঝতে পারলো। ওরা দু'জন একসঙ্গে যখন কাজ করতো তখন মনে হতো যেন দুটি অদ্ভুত মানুষ। একজন অপূর্ব সুন্দর আর একজন কুৎসিত কদাকার। যেমন স্বর্গ আর নরক, আকাশ আর পাতাল।

আজকাল বিজয়া আর নূরীর মধ্যেও বেশ ভাব জমে উঠেছে, উভয়ের উভয়কে না হলে চলেই না যেন।

বিজয়া কিন্তু আজও নূরীকে বনহুরের সঙ্গে মিশতে দেয় না, নানা ছলনায় সে ওকে ওর কাছ হতে দূরে সরিয়ে রাখে।

অবুঝ বিজয়া জানে না নূরীর সঙ্গে তার তিলকের কি সম্বন্ধ।

একদিন বনহুর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও জমাট হয়ে উঠেনি।

বাইনোকুলার দিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো সে [illegible]

আশেপাশে কেউ নেই তখন।

বিজয়া ক্যাবিনে ছিলো।

নূরী এসে দাঁড়ায় বনহুরের পাশে।

বনহুর তখনও স্থির নয়নে তাকিয়েছিলো সম্মুখপানে [illegible] দূরে। নূরীর উপস্থিতি সে বুঝতেই পারে না। নূরী ডাকে—হুর!

বনহুর চোখ থেকে বাইনোকুলার সরিয়ে ফিরে তাকায়— নূরী!

হুর, এমন করে আর দূরে দূরে থাকতে পারবো না— [illegible] ....নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলে।

বনহুর ওকে গভীর আবেগে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে মুখখানা উঁচু করে ধরে— নূরী, আমারও কিন্তু তোমার মতই কষ্ট হচ্ছে। এত কাছে পেয়েও কত দূরে.... কিন্তু তুমি তো আমারই আছো— এই টুকু সান্ত্বনা।

আমার কিন্তু মনে হয় তুমি যেন অনেক দূরে সরে গেছো, আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। হুর, কেন আমার এমন মনে হয় জানি না।

তোমার মনের দুর্বলতা নূরী, সব সময় হয়তো কিছু ভাবো।

কি ভাবি?

হয়তো আমাকে অবিশ্বাস করো।

নূরী একটু অভিমান করে বলে— অবিশ্বাস তোমাকে কোনো দিনও করি না, আমি জানি তুমি পবিত্র, নিষ্পাপ।

হাঁ, এই বিশ্বাসই আমাকে সব সময় জয়ী করেছে। নূরী..... আমার নূরী..... নূরীর মুখখানা তুলে ধরে বনহুর,তারপর গভীর চুম্বনে রাঙা করে তোলে ওর ওষ্ঠদ্বয়। কতদিন পর ওকে এত কাছে পেয়েছে।

ঠিক ঐ সময় বিজয়া এসে পড়ে সেখানে।

বনহুর নূরীকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

বিজয়া নূরী আর বনহুরকে দেখো মুখখানা গম্ভীর করে ফেলে, বলে সে — তিলক, তুমি এখানে।

হাঁ বিজয়া।

ফুল নিয়ে খেলা করছিলে, জানতাম না। তাহলে এখানে আসতাম না আমি।

বিজয়া!

তিলক, এতদিন তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা দেবতার মতই নির্মল। আর আজ আমার সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। বেশ.... বিজয়া গম্ভীর মুখে চলে গেলো সেখান থেকে।

নূরী বিজয়াকে অনুসরণ করলো।

বনহুরের মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসির রেখা। ওরা চলে যেতেই বনহুর বাইনোকুলার চোখে তুলে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

❑

আজ তিনদিন তিন রাত্রি জাহাজ এগিয়ে চলেছে।

সূরজ দ্বীপ এখন বহুদূরে।

জাহাজখানা বনহুরের নির্দেশমতই জঙ্গীনদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে।

ফাংহু বনহুরকে বিশ্বাস করেছে এবং তার কথামতই কাজ করছে। মাঝে মাঝে মাংতু এসে বনহুর আর ফাংহুর কথাবার্তা শোনো। এদের খাবার পরিবেশন করে মাংতু নিজে।

কখনও কখনও বিজয়া আর নূরীর পাশে গিয়ে বসতো কিন্তু মাংতুর অভ্যাস সে কথা বলতো কম। পাগড়ীটা কিন্তু সব সময় থাকতো তার মাথায়। পাগড়ীর আঁচলখানাকে সে এমনভাবে গলায় জড়িয়ে রাখতো যে তার মুখের অর্ধেকটা প্রায় ঢেকে থাকতো।

বিজয়া ওকে সুনজরে দেখতো না। কারণ ও প্রায়ই তাদের পাশে পাশে ঘুরঘুর করে বেড়াতো।

নূরী অবশ্য ওকে সমীহই করতো, মাংতুর আচরণ তার ভাল লাগতো। সব সময় ওদের খোঁজখবর নিতো মাংতু। কখন কি প্রয়োজন ওদের সে যেন বুঝতে পারতো। দরকারমত সব এনে হাজির করতো মাংতু তাদের

সামনে। নূরী আরও এক কারণে মাংতুকে ভালবাসতো, সে হলো বনহুরের প্রতি মাংতুর গভীর মনোযোগ। কখন সে কি খাবে মাংতু সেইভাবে সংগ্রহ করে খাবার টেবিলে এনে রাখতো। বনহুর ফল ভালবাসে. সাগরবক্ষেও মাংতু, রোজ খাবার টেবিলে কোথা হতে ফল জোগাড় করতো। বনহুর তৃপ্তির সঙ্গে খেতো।

নূরী এসব লক্ষ্য করতো, তার হুর কিসে খুশি হয়, তাতেই তার আনন্দ। মাংতু ছাড়া এ জাহাজে তাদের যে বড় অসুবিধা হতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাহাজে নূরীর মন্দ লাগছে না। কামনার জন তার সঙ্গে রয়েছে, সে পাশে রইলে মৃত্যুকেও সে ভয় করে না।

বিজয়ার সম্মুখে তাদের মধ্যে লুকোচুরি মেলামেশাও নূরীর মনে নতুন এক উন্মাদনা সৃষ্টি করে। দূর থেকে বনহুর যখন ওকে শুভেচ্ছা জানায় তখন ওর বড় ভাল লাগে।

সেই ঘটনার পর থেকে বিজয়া কিন্তু বড্ড গম্ভীর হয়ে পড়েছে। নূরীর সঙ্গে বেশ মিল জমে উঠেছিলো, ঐদিনের পর থেকে কথা বলে না সে ওর সঙ্গে। নূরী কিন্তু সব সময় ওর সঙ্গে মিশতে চায়।

একদিন নূরী বসে আছে ক্যাবিনে, — আজ তার মনটা সন্তান জাভেদের জন্য বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বারবার জাভেদের মুখখানা ভেসে উঠেছে তার মনের পর্দায়। কতদিন সে সন্তানকে দেখেনি। না জানি এখন জাভেদ কত বড় হয়েছে, কেমন হয়েছে।

এমন সময় বিজয়া ক্যাবিনে প্রবেশ করে, সোজা এসে দাঁড়ায় সে নূরীর পাশে, রুক্ষ কঠিন কণ্ঠে বলে— ফুল, তুমি জানো না তিলক আমার কে। জানলে তুমি সেদিন অমন করে ওর কাছে যেতে না প্রেম ভিক্ষা করতে।

নূরী ভ্রু কুঁচকে তাকায় বিজয়ার মুখের দিকে।

বিজয়া তবু বলেই চলেছে— তুমি যতই মনে করো তিলককে কিছুতেই তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

নূরী সচ্ছকণ্ঠে বলে উঠলো— বিজয়া, আমি চাইনে তোমার তিলককে কেড়ে নিতে।

তাহলে সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কেন গিয়েছিলে ওর পাশে?

বলবো না।

জানি তুমি অপরাধী তাই বলবে না। কিন্তু মনে রেখো ফুল, তোমার আশা পূর্ণ হবে না কোনোদিন। তুমি জানো না, তিলক দেবতার চেয়েও পবিত্র।

নূরীর চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠে। বিজয়া তাকে যতই তিরস্কার করছে ততই ওর মনে এক অপূর্ব অনুভূতি দোলা দিয়ে যাচ্ছে। স্বামীর গর্বে বুক তার স্ফীত হয়ে উঠেছে। তার স্বামী দেবতার চেয়েও পবিত্র .... বারবার বিজয়ার কথাটা তার কানে মধু বর্ষণ করে। ছুটে বেরিয়ে যায় নূরী।

বনহুর তখন জাহাজের ইঞ্জিনে কোনো একটা কাজে ব্যস্ত ছিলো। আশেপাশে তার কেউ নেই, সে একাই কাজ করছিলো।

এমন সময় নূরী ছুটে এসে বনহুরের কণ্ঠ ধরে তার বাহু দুটি দিয়ে, তারপর চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় ওর গাল দুটো।

বনহুর ভেবে পায় না নূরী হঠাৎ আজ এমন হলো কেন। আশ্চর্য হয়ে বলে— কি করছো নূরী।

বনহুরের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে যেমন ঝড়ের মত এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো সে।

বনহুর কিছু বুঝতে না পেরে একটু হেসে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিলো।

এমন সময় ফাংহু ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রবেশ করলো সেখানে— পরদেশী বাবু, শীগ্গীর আসুন, আমাদের জাহাজ থেকে দূরে কোনো একটা জাহাজ নজরে আসছে।

বনহুর হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ওপাশের টেবিল থেকে বাইনোকুলারটা হাতে তুলে নিয়ে বললো—চলো দেখি।

সম্মুখ ডেকে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর ফাংহু লং। ফাংহু লং-এর হাতে বাইনোকুলার।

দু'জনই চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। বনহুর দেখতে পেলো— একটি জাহাজ দূরে, অনেক দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর সম্মুখে দৃষ্টি রেখেই বললো— আজ এক সপ্তাহ পর আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি। জাহাজখানা জঙ্গীনদের প্রবেশ পথে পাহারারত রয়েছে।

ফাংহু বললো— আমারও তাই মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো— এটা পুলিশ জাহাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ জাহাজখানা নড়ছে না, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে স্থির হয়ে আছে।

ফাংহু বললো—পরদেশী বাবু, ওরা এখনও আমাদের দেখতে পায়নি, এখনও সময় আছে, পিছু হটে অন্য পথে নীলনদ পেরিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না।

ফাংহুর কথায় বনহুর চট্ করে কোনো জবাব না দিয়ে বাইনোকুলারের দৃষ্টি রেখে লক্ষ্য করতে লাগলো, তারপর বললো— আজ ক'দিন হলো আমরা নীলনদের দক্ষিণ দিক ধরে অগ্রসর হচ্ছি ফাংহু?

ফাংহু বললো— আজ এক সপ্তাহ হলো।

এবার বনহুর বাইনোকুলার চোখ থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, একটু হেসে বললো— একটি সপ্তাহ নষ্ট করে আমরা এতদূর অগ্রসর হয়েছি সেকি ফিরে যাবার জন্য। ফাংহু, তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।

যুদ্ধ!

হাঁ।

পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও পরদেশী বাবু?

পুলিশের সঙ্গে বলে নয়, যারা আমাদের চলার পথে বাধা দেবে তাদের সঙ্গে।

হাঁ ঈশ্বর! ফাংহু কপালে হাত রেখে শব্দটা উচ্চারণ করলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, ফাংহু ইচ্ছা করে যুদ্ধ করতে চায় না। যদিও তার জাহাজে যুদ্ধ সামগ্রীর কোনো অভাব নেই। ফাংহু চায় যতদূর সম্ভব যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে। অহেতুক জীবন নাশ তার পছন্দ নয়।

বনহুর পুনরায় বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখে সম্মুখে তাকালো, তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো সে জাহাজখানাকে।

বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললো বনহুর— ফাংহু, আমাদের জাহাজখানাকে সরাসরি সম্মুখে এগিয়ে চলার জন্য বলো।

ফাংহু চলে গেলো, জাহাজের চালককে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলো সে বনহুরের পাশে।

এবার বনহুর আর ফাংহু মেসিনরুমে প্রবেশ করলো। মেসিনরুমের সম্মুখে শার্শীর পাশে পাশাপাশি দুটো ছিদ্রপথ দিয়ে দেখতে লাগলো বনহুর।

জাহাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর বললো— ফাংহু, ম্যাপখানা আমার দরকার।

ফাংহু দ্রুত ম্যাপখানা এনে বনহুরের সম্মুখে মেলে রাখলো।

বনহুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে ধরলো ম্যাপখানায়। গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে লাগলো। মাঝে মাঝে ফাংহুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো এটা সেটা। নীল নদের অনেক পথ তার জানা নেই।

বনহুর ম্যাপের এক স্থানে আংগুল রেখে বললো— জঙ্গী নদের প্রবেশপথ ছেড়ে আমরা এখন কত মাইল দূরে আছি ফাংহু?

ফাংহু বললো— কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানাচ্ছি। কথাটা বলে ফাংহু একটা সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে মিটার লাইট জ্বলে উঠলো। ওদিকের একটা বাল্ব জ্বলছে আর নিভছে, সেই সঙ্গে কাঁপতে থাকে মাইল মিটার যন্ত্রটা। দ্রুত মিটারের কাঁটা সরে যাচ্ছে।

বনহুর আর ফাংহু তাকিয়ে আছে মাইল মিটার কাঁটার দিকে। মিটার কাঁটা এসে থেমে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর বলে উঠলো— ফাংহু, আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই আছে জাহাজখানা— আর বিলম্ব নয়, আমাকে সাহায্য করো।

বনহুরের কথায় ফাংহু বললো— কি করতে চাও?

ঐ জাহাজটাকে আমি আটক করতে চাই। বনহুর জানে, চুম্বক মেশিনে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যের বস্তুকে আকর্ষণ করা যায়, তাই সে ফাংহুকে জানালো তার মনের কথা।

ফাংহু সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে জাহাজের সমস্ত খালাসীর মধ্যে কথাটা জানিয়ে দিলো, এবার আমরা চুম্বক মেসিনের কাজ শুরু করবো।

ইঞ্জিন থেকে হেডচালক জানালো তারা প্রস্তুত আছে।

ফাংহু চুম্বক মেসিনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর তখনো মাইল মিটারের কাঁটা লক্ষ্য করছিলো।

ফাংহু চুম্বক মেসিনের পাশে দাঁড়িয়ে সম্মুখের ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। খালি চোখে কিছুই নজরে এলো না। ফাংহু বাইনোকুলারটা তুলে নিলো হাতে। দেখতে লাগলো সে বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে। জাহাজখানা এখনো স্পষ্ট নজরে আসছে না।

মাইল মিটারের কাঁটা দ্রুত সরে যাচ্ছে।

জাহাজ অত্যন্ত স্পীডে এগুচ্ছে।

বনহুরও মাঝে মাঝে বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখে সম্মুখের জাহাজখানাকে লক্ষ্য করছে। এবার বনহুর বলে উঠলো— ফাংহু, তোমার কাজ শুরু করো।

ফাংহু চুম্বক মেসিনের যন্ত্র চালু করে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানা দুলে উঠলো ভীষণভাবে।

বনহুর কিন্তু বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে আছে সম্মুখের দিকে।

চুম্বক মেসিনের সুইচ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে ক্ষুদ্র জাহাজখানায় কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এটাই তার জানা দরকার। তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করছে বনহুর।

এখানে ফাংহু চুম্বক মেসিনের চাকা চালু করে দিয়ে সেও বাইনোকুলারের চোখ রেখে তাকাচ্ছে সামনে।

বনহুর বলে—এবার মনে হচ্ছে জাহাজখানা এগুতে শুরু করেছে।

ফাংহু জবাব দিলো— হাঁ, কাজ শুরু হয়ে গেছে পরদেশী বাবু।

বনহুর বললো— ফাংহু, খুব হুশিয়ার, স্পীডে মেসিন চালাও। জাহাজখানাকে যতদূর সম্ভব দ্রুত টেনে নিতে হবে।

পরদেশী বাবু, ধীরে ধীরে কাজ করাই আমাদের ভাল, কারণ জাহাজখানা পৌঁছবার আগে আমাদের প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে; কেননা, ও জাহাজে শত্রু আছে।

বনহুর বললো— শত্রু আছে বলেই দ্রুত কাজ করতে হবে। আমাদের জাহাজে সবাইকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়ে দাও।

ফাংহুকে কথাটা বলে বনহুর নিজে এসে চুম্বক মেসিনের সম্মুখে দাঁড়ায়— তুমি যাও, নিজেও প্রস্তুত হয়ে নাওগে ফাংহু।

ফাংহু অবাক হয়ে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে— বলে কি, পরদেশী বাবু পারবে চুম্বক মেসিন চালাতে!

বনহুর ফাংহুর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলে— তুমি কিছু ভেবো না ফাংহু, নিশ্চিত মনে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

ফাংহু মুচকি হেসে বেরিয়ে যায়।

বনহুর চুম্বক মেসিনের সুইচে হাত রাখলো, দক্ষিণ হাতে তার বাইনোকুলার। ওয়্যারলেসে মুখ রেখে এবার বনহুর নির্দেশ দিতে শুরু করলো।

ফাংহু এবার এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন ক্যাবিনে। সে জাহাজের চালকদের জাহাজ চালানো ব্যাপারে হুশিয়ার করে চললো।

বনহুর দেখছে, অদ্ভুত কাজ করছে চুম্বক মেসিনটা। বহু দূরের জাহাজখানাকে দ্রুতগতিতে আকর্ষণ করে চলেছে। কিছু সময়েই যে জাহাজখানা তাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ বনহুর ফিরে তাকায় পিছনে, দেখতে পায় মাংতু অদূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। বনহুর তাকাতেই সে এগিয়ে এলো, একটা রাইফেল এগিয়ে ধরলো— এটা রেখে দাও পরদেশীবাবু।

বনহুর মাংতুর হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে পাশে [illegible] রাখলো।

মাংতু চলে গেলো।

বনহুরের মুখে একটু হাসির আভাস ফুটে উঠলো।

❑

চীৎকার করে চলেছেন মিঃ জাফরী, শীগ্‌গীর আপনারা জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যান। বোট নামিয়ে দিতে বলুন। দেখছেন না আমাদের জাহাজখানা কেমন বেগে পেছনে ছুটে চলেছে।

মিঃ লেহরী, মিঃ গুহ, মিঃ ইলিয়াস বিক্ষিপ্তের মত ছুটোছুটি করে চলেছেন, সকলের চোখেমুখেই উত্তেজনার ছাপ।

জাহাজের খালাসী এবং পুলিশ ফোর্স সকলেই উন্মাদের মত এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। ক্যাপ্টেন আর জাহাজের চালকগণ জাহাজের গতি রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

সকলের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে জাহাজখানা দ্রুতগতিতে পেছনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবল সবাই ভয়ে, বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁদের জাহাজ হঠাৎ এভাবে কেন পেছন দিকে ছুটতে শুরু করেছে, তার কারণ কিছুতেই বুঝতে পারে না।

পুলিশ ফোর্স কোনোদিন এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখেনি, তারা ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছে। মিঃ জাফরী বা তাঁদের অধিনায়কদের কথা না নিয়ে তারা পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটছে, কেউ কেউ স্পীড বোট নামানোর চেষ্টা করছে।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—একি ভূতুড়ে ব্যাপার!

মিঃ গুহ বললেন—অদ্ভুত! এটা ভূতুড়ে কাণ্ড ছাড়া কিছু নয়, নিশ্চয়ই কোনো দৈত্য-দানবের আকর্ষণে আমাদের জাহাজখানা এমনভাবে ছুটে চলেছে।

মিঃ লেহরী কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন— বনহুরকে গ্রেফতার করতে এসে শেষ পর্যন্ত মরতে হলো।

মিঃ জাফরী এত বিপদেও মোটেই ঘাবড়ে যাননি, তিনি বলে উঠলেন— না মরতেই আপনারা ভূত হয়ে গেছেন। শীগ্গীর যান, ওয়ারল্যাসে আমাদের বিপদ-সংবাদটা আমাদের অন্যান্য জাহাজে জানিয়ে দিন।

মি ঃ ইলিয়াস ছুটলেন ওয়ারলেস মেসিন ক্যাবিনে। সংবাদটা দ্রুত জানিয়ে দিলেন অন্যান্য পুলিশ জাহাজে। আরও জানালেন, তোমরা দ্রুত ১ নং জাহাজখানার উদ্ধারে এগিয়ে এসো।

২ নং জাহাজখানা তখন নীল নদের পূর্ব অঞ্চলে পাহারারত ছিলো। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লোরী ছিলে এ জাহাজে, আর ছিলো প্রায় বিশ-পঁচিশ জন পুলিশ। আরও ছিলো নানারকম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

মিঃ লোরী তাঁর জাহাজে বসে যখন জানতে পারলেন ১ নং জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়েছে তখন তিনি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ক্যাপ্টেনকে জাহাজখানা দ্রুত নীল নদের দক্ষিণ দিক অভিমুখে রওনা দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

৩নং জাহাজখানা বন্দীদের নিয়ে ইতোপূর্বেই কান্দাই অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে।

আরও দু'খানা লঞ্চ ৪ নং এবং ৫ নং মধ্য নীল নদে ঘোরাফেরা করছিলো। কোনো জাহাজ যেন বিনা সার্চে পালাতে সক্ষম না হয়, এটাই ছিলে তাদের লক্ষ্য। মিঃ ইলিয়াস ৪ নং এবং ৫ নং লঞ্চেও ওয়্যারলেসে এই দুঃসংবাদ জানালেন।

মুহূর্তমধ্যে সব জাহাজেই এই দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। সবাই যখন জানতে পারলো ১ নং পুলিশ জাহাজ জঙ্গী নদের প্রবেশপথ থেকে কোনো এক ভৌতিক আকর্ষণে উল্টোদিকে দ্রুত ছুটে চলেছে তখন ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো তারা। কেউ ঠিকমত কোনো মতামত কাউকে জানাতে পারলো না

মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনীর আপ্রাণ চেষ্টায় দু'একটা স্পীড বোট পানিতে নামাতে সক্ষম হলেন কিন্তু তাঁরা কেউ স্পীড বোটে নামতে

পারলেন না। স্পীড বোট পানিতে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] যাচ্ছিলো। কারণ খুব বেগে জাহাজখানা পিছু হটে চলেছে। [illegible] [illegible] জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে বোট পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে যাচ্ছিলো।

মিঃ লোরী কোনোক্রমেই তাঁর জাহাজ নিয়ে মিঃ জাফরীর জাহাজের নাগাল পেলেন না।

মিঃ লোরীর জাহাজেই ছিলেন মিঃ লারলং, তিনি ব্যাপারটা জেনে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে পড়েছেন। একি অদ্ভুত কাণ্ড, তবে কি সত্যি সত্যি ভৌতিক ব্যাপার! তিনি অনেক ভেবে বললেন—মিঃ লোরী, আপনারা যাই বলুন ভৌতিক ব্যাপার বা ঐ ধরনের কিছু নয়, নিশ্চয়ই কোনো চুম্বক পর্বতের আকর্ষণে জাহাজখানা ঐভাবে পেছন দিকে ছুটে চলেছে।

মিঃ লারলং-এর কথা মিঃ লোরী বললেন— হাঁ, এ রকম হতে পারে।

মিঃ লারলং বললেন— এ ক্ষেত্রে আমাদের জাহাজ নিয়ে ঐ দিকে আর অগ্রসর না হওয়াই ভাল, বরং ৫ নং এবং ৪নং জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি করা যায় ভেবে দেখা দরকার।

মিঃ লারলং তৎক্ষণাৎ ওয়ারলেসে ৪ নং এবং ৫ নং জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। এ জাহাজ দু'খানা সংবাদ পাওয়া মাত্র ২ নং জাহাজখানার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো, মিঃ লারলং এর সঙ্গে মিলিত হয়ে কি করা যায় ভেবে দেখবে।

এ জাহাজ দু'খানার পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও ভীষণ একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। অধিনায়কগণের মধ্যে শুরু হলো শলা-পরামর্শ— এখন কি করা যায়!

মিঃ লারলং ওয়্যারলেস মেসিন খুলে বসে আছেন। বারবার তিনি শুনতে পাচ্ছেন মিঃ ইলিয়াসের ভয়-বিহ্বল কণ্ঠ। মাঝে মাঝে কিছু শোনা যাচ্ছে না, কখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কখনও শোনা যাচ্ছে মিঃ লেহরীর কণ্ঠস্বর— আমরা কোনোক্রমে জাহাজের গতি রোধ করতে সক্ষম হচ্ছি না। আমাদের জাহাজ একটানা পেছন দিকে এগিয়ে চলেছে। কয়েকখানা স্পীড বোট নীচে নামাতে সক্ষম হয়েছিলাম কিন্তু নামানোর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেছে..... কথাগুলো কাঁপা কাঁপা সুরে শোনা যাচ্ছিলো, আবার ভেসে আসে

সেই স্বর..... আমরা কেউ জাহাজ থেকে বোটে নামতে পারিনি.... যেভাবে জাহাজখানা ছুটে চলেছে তাতে যে কোনো মুহূর্তে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ ভেংগে চুরমার হয়ে যেতে পারে। মৃত্যু আমাদের অনিবার্য... হঠাৎ ওয়্যারলেসের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়।

মিঃ লারলং-এর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়লো। পাশে দাঁড়িয়ে মিঃ লোরী সব শুনছিলেন, তিনি বললেন— সর্বনাশ, এতক্ষণ তবু ১ নং জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো, এবার তাও বিচ্ছিন্ন হলো। নিশ্চয়ই জাহাজের কোনো ক্ষতি হয়েছে নয় ওয়্যারলেস মেসিন নষ্ট হয়ে গেছে।

অনেক চেষ্টা করেও আর কোনো শব্দ শোনা গেলো না। দিশেহারা হয়ে পড়লেন মিঃ লারলং এবং মিঃ লোরী। কি করবেন তাঁরা ভেবে ব্যাকুল হলেন। সমস্ত জাহাজে একটা ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ ফোর্সের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিলো।

❑

মিঃ জাফরী মিঃ লেহরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারসহ পঁচিশ জন পুলিশকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে এলো বনহুর ফাংহুর জাহাজে। বনহুরের সমস্ত দেহে জমকালো পোশাক ছিলো, মাথায় ছিলো পাগড়ী। পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা তবু মিঃ জাফরীর চিনতে বাকী রইলো না। যে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য তাঁরা এত পরিশ্রম করে নীলনদের বুকে কড়া পাহাড়া দিচ্ছিলেন, সেই দস্যুই বিনা কৌশলে তাঁদের বন্দী করে ফেললো।

দস্যু বনহুর তাদের জাহাজ আটক করেছে এটা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি, পারলে কিছুতেই এভাবে সবাইকে আটক করতে পারতো না। ভীষণ একটা যুদ্ধ হতো এবং দু'পক্ষেই কিছু না কিছু হতাহত হতো। রাগে-ক্ষোভে মিঃ জাফরী অধর দংশন করতে লাগলেন।

পুলিশ বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে পিছমোড়া করে বেঁধে এক জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছে।

সম্মানিত অফিসারগণকে পিছমোড়া করে না বেঁধে শুধু হাত দু'খানায় শিকল পরানো হয়েছে। কারো কাছে কোন অস্ত্র নেই। অফিসারদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। মিঃ জাফরীর মুখ অত্যন্ত কঠিন দেখাচ্ছে। মিঃ ইলিয়াস তাঁর বিশাল বপু নিয়ে রীতিমত ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। মিঃ লেহরী, মিঃ গুহ এঁদের অবস্থা অবর্ণনীয়। এঁরা এতদিন দস্যু বনহুরের নামই শুনে এসেছিলেন, আজ সেই দস্যু বনহুরের হাতে বন্দী হয়ে হৃদকম্প শুরু হয়েছে তাঁদের।

বনহুর এসে দাঁড়ালো তাঁদের সম্মুখে।

বন্দী পুলিশ বাহিনী এবং অফিসাররা ভয় ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছে দস্যু বনহুরকে। যে দস্যু বনহুর ছিলো তাঁদের কল্পনার বস্তু, যে দস্যুকে গ্রেফতার করতে পারলে লক্ষ টাকা পুরস্কার, যে দস্যু বনহুরের সন্ধানে হাজার হাজার পুলিশ ফোর্স সদা-সর্বদা সারা দেশে সতর্ক পাহারারত রয়েছে, সেই দস্যু আজ তাদের সম্মুখে। আশ্চর্য হয়ে দেখছে পুলিশ বাহিনী।

বনহুর তার দক্ষিণ পা পাশের উঁচু বেঞ্চের উপর তুলে দাঁড়ালো। বনহুরের চোখ দুটো শুধু মুক্ত, মুখের নীচের অংশ সম্পূর্ণ ঢাকা।

বনহুর নিজকে কোন সময় প্রকাশ করতো না, যখন সে দস্যুবেশে হাজির হতো কারো সম্মুখে তখন তার মুখের অর্ধেক ঢাকা থাকতো। সেই কারণে আজ পর্যন্ত কেউ বনহুরের আসল রূপ দেখেনি বা দেখার সুযোগ পায়নি। যারা বনহুরকে স্পষ্টভাবে দেখেছে তারাই শুধু জানে কেমন দেখতে সে।

এতগুলো পুলিশের লোকের মধ্যে একমাত্র মিঃ জাফরী ছাড়া কেউ বনহুরকে প্রকাশ্য দেখেনি, তিনিই শুধু জানেন বনহুরের চেহারা কেমন।

এত বিপদের মধ্যেও পুলিশ বাহিনীদের মনে দস্যু বনহুরের আসল রূপ দেখার বিপুল বাসনা জাগছিলো। মরবে তবু দস্যু বনহুরকে একনজর

দেখবে, এটাই যেন তাদের সাধ। সবাই তাকাচ্ছে বারবার বনহুরের কালো কাপড়ে ঢাকা মুখখানার দিকে। কিন্তু দুটো চোখ আর একটা সুন্দর প্রশস্ত ললাট ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছিলো না।

বনহুর এ জাহাজে তার ইচ্ছামত পোশাক পেয়েছিলো। যেমন তার পছন্দমত খাবারের অভাব ছিলো না তেমনি সব পেয়েছিলো সে এ জাহাজে। অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু।

মাংতু সব সময় সকলের অলক্ষ্যে খেয়াল রেখেছিলো বনহুরের উপর। তার যেন কোনোরকম অসুবিধা না হয়।

অবশ্য ফাংহুর সহযোগিতা কম ছিলো না, ফাংহু বনহুরকে বন্ধুর মতই গ্রহণ করেছিলো, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে সাহায্য করে চলেছে বনহুরকে।

এ জাহাজে যারা খালাসীর বেশে ছিলো তারাও এক একজন কম নয়। দুঃসাহসী বীরযোদ্ধার মতই এক-একজন শক্তিশালী। বনহুর অল্প সময়েই সবাইকে চিনে নিয়েছে। এরা শুধু শক্তিশালী নয়, এরা সংগ্রামী পুরুষ। আরও একটা জিনিস বনহুর লক্ষ্য করেছে, এ জাহাজের প্রতিটি ব্যক্তি তাকে অত্যন্ত সম্মান আর সমীহ করে।

এ জাহাজে অনেক কিছুই বনহুরের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। কোনো একটা অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা এ জাহাজের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে, তাও বুঝতে পেরেছে বনহুর। সন্তুষ্ট হয়েছে সে এ জাহাজের প্রতিটি জিনিস দেখে, প্রতিটি মানুষের আচরণে।

আজকের এ জয়ের পিছনে ফাংহুর সহযোগিতা তাকে মুগ্ধ করেছে। যে পুলিশ বাহিনী তাকে গ্রেফতার করার জন্য সুদূর কান্দাই নগরী থেকে বেশ কিছুদিন হলো আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে নীল নদের বুকে পাহারারত রয়েছে, তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে বনহুর। কৌশলে জাঁদরেল পুলিশ বাহিনীকে সে হাতের মুঠায় এনেছে।

বনহুর এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো— মিঃ জাফরী, বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলো। আপনি যেমন আমাকে ভুলেননি, আমিও তেমনি ভুলিনি

আপনাকে। তাই অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসেছি বন্ধু! বলুন, এবার কি চান আমার কাছে?

মিঃ জাফরীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে, কারণ একবার নয়, কয়েকবার তিনি দস্যু বনহুরের হস্তে নাকানি-চুবানি খেয়েছেন। এবার তাঁদের এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পুনরায় বনহুরের হস্তে এসে পড়বেন ভাবতেও পারেননি, কারণ তাঁরা সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েই নীল নদে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রসহ পুলিশ বাহিনী কম ছিলো না তাঁদের হাতে, তবু এই পরাজয়! বনহুরের দিকে মিঃ জাফরী কটমট করে তাকালেন, কোনো জবাব দিলেন না।

বনহুর পুনরায় বললো— জানি আপনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, আপনি চরম দুঃখ অনুভব করছেন। এবার বনহুর ফাংহুর দিকে তাকিয়ে বললো— ফাংহু, সম্মুখসারির বন্ধুদের বন্ধন মুক্ত করে দাও।

ফাংহু অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর ফাংহুর মনোভাব বুঝতে পেরে একটু হেসে বললো— বন্ধুর প্রতি প্রীতিকর আচরণ করাই শ্রেয়। এরা আমার বন্ধুজন।

ফাংহু এবার পুলিশ অফিসারদের হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিলো।

একপাশে কয়েকটা আসন ছিলো, বনহুর সেই আসনগুলো দেখিয়ে বললো— আসন গ্রহণ করুন আপনারা। ফাংহু, এদের জন্য গরম কফির ব্যবস্থা করো।

ফাংহু চলে যায়।

বনহুর একা দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ বাহিনীর সম্মুখে।

বনহুরের কথায় পুলিশ অফিসারদল আসন গ্রহণ না করে যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি থাকেন।

বনহুর দু'একবার পায়চারী করে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তারপর বলে কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন, কারণ আমি আপনাদের বক্তব্য শুনতে চাই।

মিঃ জাফরী এবার না বলে পারলেন না, বললেন তিনি— তুমি আমাদের বন্দী করে কি করতে চাও আমিও জানতে চাই বনহুর?

অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর, সে হাসি যেন থামতে চায় না। তারপর বলে উঠে— লক্ষ টাকা পুরস্কারের আশায় আপনি যেমন আমাকে খুঁজে ফিরছিলেন তেমনি আমিও আপনার বিনিময়ে লক্ষ টাকা চাই। আর আপনার সঙ্গীদের বিনিময়ে চাই আমাদের পঞ্চাশজন বন্দীর মুক্তি। বনহুর হীরালালের সঙ্গীদের কথাই বললো।

মিঃ জাফরী চমকে উঠলেন না, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যাদের বন্দী করা হয়েছিলো তারা দস্যু বনহুরেরই অনুচর, কাজেই তিনি নীরব রইলেন।

মিঃ ইলিয়াস বললেন এবার— কাউকে আমরা বন্দী করিনি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো— মিথ্যে কথা বলে কোনো ফল হবে না মিঃ ইলিয়াস। কারণ, আমি সব জানি এবং জানি বলেই আপনাদের এত কষ্ট দিলাম।

দস্যু বনহুরের মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হলেন মিঃ ইলিয়াস, কারণ বনহুর তাকে কি করে চিনেছে ভেবে পেলেন না তিনি।

বনহুর মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো— কি ভাবছেন মিঃ জাফরী? ইন্সপেক্টার পদ থেকে পুলিশ সুপার পদ লাভ করেছেন, দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসেবে আপনার যথেষ্ট সুনাম আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনি দস্যু বনহুরকে আটক করতে পারলেন না, বড় আফসোস! একবার নয়, বেশ কয়েকবার বনহুরের কাছে পরাজয়ও বরণ করলেন, দুঃখ হয় তবু সেই বনহুরের পিছু ছাড়লেন না।

মিঃ জাফরী বনহুরের কথায় কোনো জবাব দিলেন না, মুখ ফিরিয়ে রাখলেন বিপরীত দিকে।

বনহুর বললো আবার— এখন আপনারা আমাদের অতিথি, কাজেই আমাদের কাছে কোনোরকম অসম্মান বা অনাদর পাবেন না। ইচ্ছা করলে আমি আপনাদের সবাইকে হত্যা করে নীল নদে নিক্ষেপ করতে পারি। কেউ

জানবে না আপনারা কোথায় আছেন কিংবা কোথায় গেছেন, কিন্তু তা করবো না, মুক্তিও দেবো না। এই নীল নদেই আপনাদের কাটাতে হবে যতদিন না আমার পাওনা আদায় হবে। কথাটা বলে ফাংহুর দিকে তাকায় বনহুর —এদের নিয়ে যাও।

ফাংহু এবার মিঃ জাফরীসহ অফিসারগণকে নিয়ে গেলো একটা বড় ক্যাবিনে, সেখানে তাঁদের রাখা হলো।

অন্যান্য পুলিশকে অপর একটা ক্যাবিনে আটকে রাখা হলো।

পুলিশ বাহিনীকে বন্দী করে রাখলেও তাদের প্রতি কোনো অসৎ ব্যবহার করলো না বনহুর বা ফাংহুর দলবল। অপর একটি জাহাজের ব্যবস্থা করা হলো, সেই জাহাজে পুলিশ অফিসার ও পুলিশ বাহিনীকে আটক রেখে বনহুর আর ফাংহু ছুটলো যে জাহাজে হীরালালের দলকে বন্দী করে কান্দাই অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সেই জাহাজের উদ্দেশ্যে।

বন্দীদের নিয়ে জাহাজ নীল নদের কোন্ অংশ ধরে যাচ্ছিলো একথা বনহুর জেনে নিলো ভাল করে মিঃ জাফরীর জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে। ক্যাপ্টেন লিউ পুলিশ জাহাজের ১ নং জাহাজখানা পরিচালনা করছিলেন।

বনহুর ক্যাপ্টেন লিউকেও বন্দী করে নিয়ে চললো সঙ্গে তাদের জাহাজে। কোন্ পথে তাদের ৩ নং জাহাজ গেছে সেই পথের নির্দেশ দিতে লাগলো মিঃ লিউ। অবশ্য বনহুর তার পাশে দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছিলো সম্মুখপানে দূরে তার দৃষ্টি রইলেও ক্যাপ্টেন লিউকেও সে লক্ষ্য করছিলো ভালভাবে। কোনোরকম মন্দ অভিসন্ধি থাকলে তাকে সেই মুহূর্তে হত্যা করে নীল নদের জলে নিক্ষেপ করা হবে, একথাও ক্যাপ্টেন লিউকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

বনহুর যখন চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে সম্মুখে তাকিয়ে দেখছিলো তখনও তার মুখের নীচের অংশ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিলো।

মিঃ লিউ তখন নির্বাক বিস্ময়ে বনহুরকে দেখছিলো। যে দস্যুকে গ্রেফতারের জন্য সমস্ত দেশব্যাপী এত আলোড়ন সেই দস্যুর পাশে সে

এখন দাঁড়িয়ে! যদি তার মৃত্যুও হয় তবু তার দুঃখ নেই, কারণ মিঃ লিউ-এর বড় সাধ ছিলো দস্যু বনহুরকে একবার স্বচক্ষে দেখা।

বনহুরের জাহাজখানা স্পীডে এগুচ্ছে।

যে জাহাজে পুলিশ অফিসারসহ পুলিশ বাহিনীকে আটক করা হয়েছিলো সে জাহাজ এখন নীলনদের পূর্ব-উত্তর অংশে স্থিরভাবে রয়েছে। বনহুরের নির্দেশমত অফিসারদেরকে এক ক্যাবিনে আটক করা হয়েছে আর পুলিশ বাহিনীকে বিপরীত এক ক্যাবিনে। ফাংহুর কয়েককন অনুচর পাহারা রয়েছে, যেন কোনো জাহাজ এ জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। ফাংহুর অনুচরদের সঙ্গে রয়েছে নানা রকম আগ্নেয়াস্ত্র। তাছাড়াও ওয়্যারলেস মেসিন রয়েছে, কোনো বিপদ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ফাংহুর জাহাজে সংবাদ পৌঁছবে।

ফাংহু মাঝে মাঝে টেলিভিশনের সুইচ টিপে দেখে নিচ্ছিলো। তাদের জাহাজের পাঁচশত মাইলের মধ্যে যে কোনো জাহাজ বা কোনো রকম জলযান থাকলে তা ধরা পড়বে এই শক্তিশালী টেলিভিশনে। পাশেই কয়েকটা সুইচ। ১ নং সুইচে চাপ দিলে পশ্চিম, ২ নং সুইচে পূর্ব, ৩ নং সুইচে উত্তর, আর ৪ নং সুইচে দক্ষিণ দিকের সব ভেসে উঠে পর্দায়। কাজেই ফাংহু জানে, পুলিশ বাহিনীর জাহাজখানা কিছুতেই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে পারবে না।

ফাংহু মাঝে মাঝে ম্যাপ খুলে দেখে নিচ্ছিলো এখন তাদের জাহাজ কোন্ পথে চলেছে।

এবার ফাংহু টেলিভিশনের সুইচে চাপ দিতেই পূর্বদিকের সাগরবক্ষ ভেসে উঠলো পর্দায়। হঠাৎ আনন্দে চীৎকার করে উঠলো— পেয়েছি, পেয়েছি..... ছুটলো সে বনহুরের কাছে।

ফাংহু ছুটে গিয়ে বনহুরকে একরকম প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে— পরদেশী বাবু, পেয়েছি, পুলিশদের জাহাজখানা পর্দায় এসে গেছে।

বনহুর অবাক হয় না, তবু কণ্ঠে বিস্ময় ভাব এনে বলে— দেখা গেছে ফাংহু?

হাঁ, এবার আমরা নিশ্চয়ই জাহাজখানাকে মিটার চুম্বক মেসিনের শক্তি দ্বারা টেনে আনতে সক্ষম হবো।

চলো, দেখবো জাহাজখানা মিটার চুম্বকের মধ্যে আছে কিনা। আসুন ক্যাপ্টেন মিঃ লিউ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে নিশ্চয়ই। তাছাড়া সিগারেট পানও হয়নি বহুক্ষণ।

ফাংহু আর বনহুর চলে গেলো।

মিঃ লিউ-এর পাশে দাঁড়ালো মাংতু—স্যার, আসুন আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

মিঃ লিউ এই যুবকটিকে দেখে অবাক হলো, কারণ এতক্ষণ সে এখানে কোথায় ছিলো বুঝতেই পারেনি তারা কেউ।

মিঃ লিউ বললো— চলো।

মাংতু মিঃ লিউকে নিয়ে একটা ক্যাবিনে এলো। একটা চেয়ারে দেখিয়ে বললো— বসুন।

মিঃ লিউ মাংতুর আচরণে খুশী হলো, কারণ এখন তার যে অবস্থা তাতে প্রতি মুহূর্তে সে মৃত্যুর আশঙ্কা করে আসছে। বনহুরের হস্তে ধরা পড়ে সে বাঁচবে, এমন আশা তার ছিলো না। মিঃ লিউ জানে, কান্দাই শহরে কত লোককে দস্যু বনহুর হত্যা করেছে, তার কোন হিসাব নেই। বহু ধনবান ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয়েছে, বহু পুলিশ অফিসার, বহু ব্যবসায়ী, অনেক গণ্যমাণ্য ব্যক্তিই বনহুরের শিকার হয়েছে। মিঃ লিউ এ কথাও জানে, দস্যু বনহুর কোনোদিন মহৎ ব্যক্তির জীবননাশ করেনি, তবু লিউ-এর ভীষণ ভয়, যদি বনহুর তাকে ক্ষমা না করে হত্যাই করে বসে। মাংতুর কথায় সন্তুষ্ট হয় মিঃ লিউ, শূন্য আসনটা দখল করো বসে পড়ে। বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো মিঃ লিউ, বহুক্ষণ তাকে বনহুরের পাশে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলো।

মিঃ লিউ আসন গ্রহণ করতেই মাংতু এক প্যাকেট মূল্যবান সিগারেট এনে সম্মুখে রাখলো তার।

ক্ষুধার্ত শৃগাল যেমন মেষ শাবককে আক্রমণ করে তেমনি ক্যাপ্টেন লিউ সিগারেটের প্যাকেট দেখামাত্র থাবা মেরে তুলে নেয় হাতে, তারপর দ্রুত প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করে গুঁজে দেয় ঠোঁটের ফাঁকে। সিগারেটের অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে— এই, তোর নাম কি?

মাংতু!

বাঃ চমৎকার নাম। আমার এক ছেলের নাম মাংতু।

মাংতু হেসে বললো— তাই নাকি স্যার!

হাঁ।

আপনার বুঝি ঐ একটি ছেলে?

না, একটি মেয়েও আছে।

তার নাম কি স্যার?

মাথাটা কাৎ করে একটু ভেবে নিয়ে বললো ক্যাপ্টেন লিউ— চাংতু।

তাই নাকি স্যার? খুশী হয়ে বললো মাংতু।

লিউ বললো এবার—চাংতু আমার বড় সুন্দরী মেয়ে। বড় কাজের মেয়ে। মাংতু?

বলুন স্যার।

তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

তাই নাকি স্যার?

হাঁ। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে চিরদিনের জন্য আপনজন করে নেই।

সে কেমন স্যার?

দুস্য বনহুরের শিষ্য হলেও তোমাকে বড় ভদ্র বলে মনে হচ্ছে, তাই.....

থামলো মিঃ লিউ।

মাংতু মাথার পাগড়ীখানা আর একটু টেনে ঠিক করে নিয়ে বললো— তাই কি বলুন স্যার?

তোমাকে জামাই করে নেবো ভাবছি......

মাংতু কান ধরে জিভ কাটলো, তারপর বললো— ছিঃ ছিঃ ও কথা বলবেন না স্যার।

কেন?

চাংতু যে আমার মায়ের পেটের বোনের নাম। দেখলেন না সেই কারণে আপনার কথা শুনে এত খুশী হয়েছিলাম।

মুহূর্তে দমে গেলো ক্যাপ্টেন লিউ। মুখখানা ভার করে কিছুক্ষণ একমনে সিগারেট পান করলো, তারপর বললো— মাংতু, তুমি বড় ভাল ছেলে।

হাঁ স্যার, সবাই আমাকে তাই বলে।

তবে দস্যুর দলে এলে কেন?

বিপদে পড়ে।

বিপদে সে কেমন কথা মাংতু?

কোথাও চাকরি না পেয়ে শেষে দস্যুদলে যোগ দিয়েছি।

ছিঃ বড় ভুল করেছো মাংতু। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? খুব বড় চাকরি দেবো, মাসে তিন শো টাকা মাইনে পাবে।

কিন্তু যাবো কি করে?

কেন, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

সর্বনাশ, তা কি করে সম্ভব?

সবই সম্ভব মাংতু। তুমি জানো না আমি ক্যাপ্টেন, জাহাজেই আমি থাকি— জাহাজ নিয়েই আমার কাজ। এ জাহাজ থেকে পালানো আমার পক্ষে মোটেই দুষ্কর নয় যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো।

সর্বনাশ, একবার বলেছেন আর বলবেন না স্যার। বনহুর যদি একটু টের পায় তাহলে আপনিও মরবেন, আমিও মরবো।

মাংতু, আমাকে বাঁচাতেই হবে। আমার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সবাই আছে। তুমি আমাকে বাঁচাও মাংতু.... তোমাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেবো। তোমার আর চাকরি করতে হবে না।

মাংতু একগাল হেসে বলে— কত টাকা দেবেন স্যার?

যা তুমি চাও।

সত্যি দেবেন?

হাঁ দেবো।

তাহলে আপনি তৈরী থাকবেন।

মাংতু, তুমি আমার বন্ধু, না না সন্তান।

স্যার, আপনি পালিয়ে কোথায় যাবেন? এ যে সাগর— চারদিকে শুধু থৈ থৈ পানি।

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না মাংতু। তুমি শুধু একখানা স্পীড বোট আমাকে সাগরবক্ষে নামাতে সাহায্য করবে।

স্যার, তাতো করবো কিন্তু তার পরের অবস্থাটা আমার চিন্তা করেছেন?

মাংতু, তোমাকেও আমি সঙ্গে নেবো।

তারপর স্পীড বোট নিয়ে আপনি কি করে কোথায় যাবেন?

হাসলো ক্যাপ্টেন লিউ— আমি ক্যাপ্টেন, সাগর আর সমুদ্র আমার সাথী। কোথায় কিভাবে যাবো সঙ্গে থাকলেই দেখতে পাবে।

আচ্ছা স্যার, আপনাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো। যাই দেখি.....

মাংতু বেরিয়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন লিউ-এর মুখে খুশীর আভাস ছড়িয়ে পড়লো।

❑

বনহুর টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি রেখে আনন্দধ্বনি করে উঠলো— ফাংহু, জাহাজখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফাংহু পকেট থেকে রুমালখানা বের করে তার কালো থেবড়ো মুখখানার উপর একবার দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললো —আমাদের জাহাজ থেকে মাত্র দেড়শত মাইল দূরে আছে ঐ জাহাজখানা।

বনহুর এবার ফিরে তাকালো মাইল মিটারের দিকে, যে মিটারে মাইলের মাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বনহুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কারণ

তাদের জাহাজের গতি আরও বাড়িয়ে দিলে পুলিশ জাহাজখানাকে পাকড়াও করতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

বনহুর নিজে এবার চললো ইঞ্জিন ক্যাবিনে, ফাংহু রইলো মেসিন ক্যাবিনে।

দক্ষ ইঞ্জিনচালকের মত জাহাজখানাকে স্পীডে নিয়ে চললো বনহুর। ফাংহু মেসিন ক্যাবিন থেকে তাকে পথের নির্দেশ দিয়ে চললো।

বনহুরকে সাহায্য করে চললো হেডচালক।

কখন যে মাংতু এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর জানে না, হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি যখন মাংতুর উপরে এসে পড়লো তখন সে আলগোছে সরে গেলো সেখান থেকে।

বনহুরের মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি।

জাহাজ তখন ভীষণ শব্দ করে ছুটে চলেছে।

বনহুরের সম্মুখে সাউণ্ড বক্সে শোনা যাচ্ছে ফাংহুর গলা, সে মেসিন ক্যাবিন থেকে অবিরত নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

মিঃ লিউ সিগারেট পান শেষ করে ক্যাবিনে বসে বসে পালানোর মতলব আঁটছিলো আর প্রতীক্ষা করছিলো মাংতু কখন আসবে। তার মাথায় শুধু পালানোর চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো না, তার মগজে আর একটি চিন্তার উদ্ভব হয়েছিলো। পালানোটা তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে, কারণ মাংতু তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে। মিঃ লিউ-এর মনে লালসার সৃষ্টি হয়, যে দস্যু বনহুরের সন্ধানে তারা আজ প্রায় মাসাধিক কাল ধরে নীলনদে নানা বিপদ উপেক্ষা করে দিন কাটাচ্ছিলো, হাজার হাজার পুলিশ বাহিনী যাকে গ্রেফতারের আশায় উন্মুখ, সেই দস্যু বনহুর তার কাছাকাছিই অবস্থান করছে। এমন সুযোগ সে কোনোদিনই পাবে না। দস্যু বনহুরকে কোনোরকমে বন্দী করতে পারলে তার যথেষ্ট সুনাম হবে, তার সঙ্গে পাবে দু'লক্ষ টাকা। সারা জীবন তাকে কোনো কাজ করতে হবে না। সে জাহাজের ক্যাপ্টেন, কি করে গোটা জাহাজখানাকে আয়ত্তে আনতে হয় সে

জানে। লিউ-এর মুখে হাসি ফুটে উঠলো, ভুলে গেলো সে উপস্থিত বিপদের কথা।

এমন সময় মাংতু এলো তার ক্যাবিনে।

ক্যাপ্টেন লিউ খুশী হলো, তাড়াতাড়ি মাংতুর পাশে এসে ওর কাঁধে হাত রাখতে গেলো। মাংতু দ্রুত সরে দাঁড়ালো, তারপর বললো— বলুন কি করতে হবে?

ক্যাপ্টেন লিউ বললো— মাংতু, তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমার জন্য আমার অনেক দুঃখ হচ্ছে।

কেন?

তোমার মত একটি সৎ মহৎ ছেলে দস্যু বনহুরের মত শয়তান বদমাইশ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছো।

ও ঃ এই কথা।

হাঁ, তাই আমার বড় দুঃখ হয়.......

মাংতু মিছামিছি একটা ব্যথাকাতর নিশ্বাস ত্যাগ করে বললো— কি করবো বলুন, সব মেনে নিতে হচ্ছে পেটের দায়ে।

মাংতু?

বলুন স্যার?

সারা জীবন যাতে তোমাকে পেটের চিন্তা করতে না হয় এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। খুশীতে মাংতুর চোখে দুটো জ্বলে উঠে, বলে সে— স্যার, কি করে হয়ে যাবে?

যদি আমার কথা শোন।

বলুন?

খুব গোপনীয় কথা।

বলুন?

ক্যাপ্টেন লিউ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়, তারপর চাপা গলায় বলে—মাংতু, অনেক টাকা পাবে যদি আমাকে তুমি সহায়তা করো।

করবো।

তুমি তো জানো দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশ বাহিনী অহরহ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

জানি।

দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে পারলে দু'লক্ষ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে....

তাও জানি স্যার।

তাহলে এমন সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়ছো কেন মাংতু?

সে আমার মনিব।

রেখে দাও তোমার মনিব, টাকা ছাড়া এ দুনিয়ায় কেউ কারো নয়, টাকাই সব।

কাজেই আমাকে কি করতে হবে বলুন?

তুমি যে আমাকে সাহায্য করবে বলেছিলে?

করবো।

কিন্তু পালানো ব্যাপারে নয়....

তবে?

দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের ব্যাপারে।

এ কি করে সম্ভব?

বলো আমাকে সাহায্য করবে কিনা?

করবো কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়। আমি যা বলবো, তোমাকে সেইমত কাজ করতে হবে।

বলুন?

বনহুর যখন রাতের খাবার খাবে তখন তার খাবারের সঙ্গে একটু ঔষধ মিশিয়ে দেবে— বাস্, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে তোমার দস্যুসম্রাট। তখন তুমি আমাকে সাহায্য করবে স্পীড বোট নামানোর ব্যাপারে। স্পীড বোট নীচে নামাতে পারলেই তখন আর কোনো চিন্তা নেই। দস্যু বনহুরকে কাঁধে

নিয়ে নীচে নেমে পড়বো ঝুলানো সিঁড়ি বেয়ে, তারপর তুমিও আসবে আমার সঙ্গে নীচে স্পীড বোটে.......

মাংতু হেসে উঠে— চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছেন স্যার।

হাঁ, তাহলে সারা জীবন আর পেটের চিন্তা করতে হবে না।

আমাকে ঠিক অর্ধেক দেবেন তো স্যার?

হাঁ, এক লক্ষ আমার, এক লক্ষ তোমার।

সত্যি, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। এতদিন এই বুদ্ধিটা আমার মাথায় আসেনি।

এবার যখন বুদ্ধিটা তোমার মাথায় ঢুকেছে তাহলে কাজে লেগে পড়ো।

কিন্তু ..... ঘাড় চুলকায় মাংতু।

কিন্তু কি মাংতু? কিছু বলতে চাও?

হাঁ।

বলো?

রাত আসতে এখনও যে ঢের বাকী স্যার।

তা প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা আছে।

স্যার, ঐ সময়ের মধ্যে আপনি আর আমি কোথায় থাকবো আর কেমন থাকবো তাই বা কে জানে। কেননা, আমাদের জাহাজ এখন পুলিশ জাহাজের একটিকে ধাওয়া করে চলেছে। আশা করা যায় আর বেশীক্ষণ বিলম্ব হবে না সেটাকে পাকড়াও করতে।

মাংতুর কথা শুনে ক্যাপ্টেন লিউ-এর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই কিছু ভেবে বললো- মাংতু, তুমি মিছামিছি আশা পোষণ করছো, আমি জানি এই জাহাজখানা ভুলপথে চলেছে।

মাংতু বললো- তাই নাকি?

হাঁ।

তাহলে তো ভীষণ ভয়ের কারণ।

তা তো নিশ্চয়ই। কোথায় কোন্ ডুবু পর্বত লুকিয়ে আছে কে জানে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জাহাজখানা নিমজ্জিত হতে পারে।

সত্যি আমার বুক কাঁপছে।

মাংতু?

বলুন স্যার।

আমাকে একটা জিনিস দিতে পারো?

কি জিনিস বলুন?

একটা অস্ত্র।

অস্ত্র!

হাঁ।

কি করবেন?

একটি অস্ত্র পেলে আমি জাহাজখানাকে ঠিকই ভুলপথে নিতে পারবো।

কেমন করে স্যার?

তুমি একটা অস্ত্র আমাকে দাও, পরে দেখবে।

কি অস্ত্র নেবেন স্যার?

পিস্তল।

পিস্তল নেই আমার হাতে।

তবে রাইফেল?

রাইফেলও না...

তুমি দেখছি কোনো কাজের লোক নও মাংতু।

ঠিক তাই। স্যার, কাজের লোক হলে কি আর এই সামান্য চাকরি নিয়ে পড়ে থাকি স্যার। অন্য কোনো অস্ত্র নিলে দিতে পারি, যেমন কামান.....

তুমি ঠাট্টা করছো মাংতু?

মোটেই না, কারণ কামানটা আমার হাতে আছে তাই ওটা আমি দিতে পারি।

মূর্খ।

মূর্খ আমি নই স্যার, মূর্খ আপনি।

মাংতু!

রাগ করবেন না স্যার, কারণ আপনার মত ক্যাপ্টেন দস্যু বনহুরকে কাবু করে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী করে স্পীড বোটে সিঁড়ি বেয়ে নামবেন, সে কথা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। পারবেন দস্যু বনহুরকে কাঁধে করে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে, তাও চলন্ত জাহাজ থেকে?

পারবো।

পিস্তল তাহলে কি করতে চান?

দরকার হলে বনহুরকে হত্যা করে তার লাশ নিয়ে গিয়ে পৌঁছাবো....

সরকারের কাছে, তাই না?

হাঁ, তাহলেই পাবো দু'লক্ষ টাকা। সরকার ঘোষণা করেছেন, দস্যু বনহুরকে মৃত কিংবা জীবিত যে কোনো অবস্থায় সরকারের সম্মুখে হাজির করতে পারলেই বাস্....

এমন সময় মেসিন গানের শব্দ শোনা যায়, তার সঙ্গে সংকেতধ্বনি।

মাংতুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

ক্যাপ্টেন লিউ বলে উঠে— ও কিসের শব্দ?

মাংতু বলে— আপনি এই ক্যাবিনে চুপচাপ অপেক্ষা করুন, ফিরে এসে সব জানাবো।

মাংতু ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে অসুসরণ করে মিঃ লিউ।

মাংতুর ঠিক পিছনেই আসছিলো সে। মাংতু ক্যাবিনের দরজায় এসে পা দিয়ে চাপ দেয় সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ক্যাবিনের মধ্যে আটকা পড়ে যায় ক্যাপ্টেন লিউ।

মাংতুর হাসির শব্দ তার কানে আসে।

ক্যাপ্টেন লিউ-এর মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে, মাংতুকে সে বিশ্বাস করে অনেক কথাই বলে ফেলেছে। সর্বনাশ, মাংতুকে সে যেমন সরল-সহজ মনে করেছিলো আসলে সে তেমন সোজা মানুষ নয়। ক্যাবিনের দরজায় মাথা ঠুকতে থাকে লিউ।

❑

পুলিশ বাহিনীর জাহাজখানা এখন ফাংহুর জাহাজ থেকে মাত্র মাইল দুই দূরে রয়েছে। ওরা দেখতে পেয়ে মেসিন গান থেকে অবিরত গুলী ছুড়ছে। ফাংহুর কয়েকজন অনুচর এসে দাঁড়িয়েছে মেসিন গান হাতে নিয়ে, পাল্টা জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে তারা।

ফাংহু তখনও মাইল মিটারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাদের জাহাজ থেকে পুলিশ জাহাজখানা কত দূরে রয়েছে। ফাংহু বা বনহুরের আদেশ পাওয়ামাত্র এরা গুলী ছুড়বে।

বনহুর এখন ইঞ্জিনে কাজ করে চলেছে।

সম্মুখে ঝুলানো সাউণ্ড বক্স থেকে ফাংহুর গলা শুনা যাচ্ছে। পথের নির্দেশ দিচ্ছে সে অবিরত। পুলিশ জাহাজটি এখন তাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। পুলিশ জাহাজ থেকে মেসিনগানের গুলী এসে পড়ছে তাদের জাহাজের আশেপাশে। ফাংহু ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ফুলছে, তবু সঙ্গীদের মেসিনগান কিংবা কামান থেকে গুলী ছুড়তে নির্দেশ দিচ্ছে না। অবশ্য বনহুরের নির্দেশ মেনে চলতে হচ্ছে তাকে। বনহুর বলেছে, ওরা গুলী ছুড়লেও তারা যেন গুলী না ছোড়ে, কারণ ও জাহাজে তাদেরই লোক বন্দী আছে।

পুলিশ বাহিনী এবার মরিয়া হয়ে গুলী ছুড়তে শুরু করলো। মেসিনগানের দু'একটা গুলী এসে পড়লো ফাংহুর জাহাজের ডেকে।

ফাংহুর একজন বিশ্বস্ত অনুচর মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফাংহু জানতে পারলো, ক্ষেপে গেলো সে ভীষণভাবে, মাইল মিটার ত্যাগ করে সে মেসিনগানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ সাউণ্ড বক্স থেকে ফাংহুর গলা বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে। ফাংহুর গলা আর শোনা যাচ্ছে না কেন? হেডচালককে ইঞ্জিনের দায়িত্ব দিয়ে ছুটলো বনহুর ডেকে।

ফাংহু তখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে মেসিনগান হাতে তুলে নিয়েছে।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই ফাংহু বললো— পরদেশী বাবু, তুমি মেসিন ক্যাবিনে যাও। এখানে থাকলে গুলী লেগে যেতে পারে।

ফাংহুর কথা শেষ হয় না, সম্মুখস্থ পুলিশ জাহাজ থেকে একটা মেসিনগানের গুলী এসে ফাংহুর বুকে বিদ্ধ হলো!

ফাংহুর রক্তাক্ত দেহখানা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ডেকের উপর।

বনহুরের মুখমণ্ডল মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো, সে ক্রুদ্ধদৃষ্টি মেলে একবার পুলিশ জাহাজখানা দেখে নিয়ে ফিরে তাকালো ফাংহুর রক্তাক্ত দেহটার দিকে, তারপর ফাংহুর হাত থেকে ছিটকে পড়া মেসিনগানটা উঠিয়ে নিলো সোজা করে।

এরপর বনহুরের রূপ পাল্টে যায়।

তার হাতের মেসিন গান গর্জে উঠে ভীষণভাবে।

কয়েক সেকেণ্ড গুলী চালাতেই মাংতু এসে দাঁড়ায় বনহুরের পাশে, বলে সে— পরদেশী বাবু, থামো!

বনহুর মুহূর্তে ফিরে তাকায়।

মাংতু নিজে আর একটি মেসিনগান নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার চোখেমুখেও একটা উত্তেজনার ভাব। আবার বলে সে— পরদেশী বাবু, তুমি ইঞ্জিনে যাও আমি এদিকে দেখছি।

বনহুর মোটেই আশ্চর্য হলো না মাংতুর হাতে মেসিনগান দেখে, সে বললো— মাংতু, তুমি পারবে পুলিশদের গুলীর পাল্টা জবাব দিতে?

পারবো, তুমি যাও বাবু।

বনহুর জানে, এ সময়ে জাহাজখানাকে খুব সাবধানে সম্মুখে নিতে হবে, কারণ একটু বেশী অগ্রসর হলে পুলিশ জাহাজের আয়ত্তে এসে যাবে এবং মেসিনগানের গুলীতে জাহাজের ক্ষতি সাধন হবে।

বনহুর ইঞ্জিন ক্যাবিনের দিকে চলে গেলো।

মাংতুর মেসিনগান মুহূর্তে মুহূর্তে গর্জে উঠতে লাগলো, অদ্ভুত দক্ষতার সাথে মেসিনগান চালাচ্ছে মাংতু।

ওদিকের পুলিশ জাহাজ থেকে অবিরত গুলী আসছে।

মাংতু নিজকে বাঁচিয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে চলেছে।

অন্যান্য খালাসী এবং ফাংহুর অনুচর সবাই অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর কৌশলে জাহাজখানাকে পুলিশ জাহাজ থেকে দূরে রেখে চালাচ্ছিলো, যাতে পুলিশ জাহাজের নিশানার মধ্যে গিয়ে না পড়ে।

বেশ কিছু সময় দু'পক্ষের গুলী বিনিময় চলার পর হঠাৎ পুলিশ জাহাজের দিক থেকে গুলী আসা বন্ধ হয়ে গেলো। তখনও মাংতুর মেসিনগান অবিরাম গুলী বর্ষণ করে চলেছে। মাংতুর কয়েকজন সাথীও এসে যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। তারাও দূর থেকে মেসিনগান এবং মর্টার চালাচ্ছে।

অতি নিকটে এসে পড়েছে তারা, এ মুহূর্তে গুলী নিক্ষেপ করা আর মোটেই উচিত হবে না।

বনহুর এসে দাঁড়ায় মাংতুর পিছনে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয় মাংতুর মেসিনগান চালানো দেখে, কিছুক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারে না। তারপর এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখে বলে— বন্ধু, এবার থামো।

মাংতু একমনে কাজ করে চলেছিলো, তার চারপাশে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। ওপাশে ফাংহুর লাশটা চীৎ হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডেকের কিছু অংশ। রণক্লান্ত ঘুমন্ত সৈনিকের মত দুটি আঁখি বন্ধ করে পড়ে আছে ফাংহু। বনহুর ফাংহুর লাশের দিকে তাকিয়ে বললো— ফাংহু ঘুমাক তুমি চলে এসো মাংতু, এবার আমরা পুলিশ জাহাজখানাকে আটক করবো।

মাংতু এবার ক্ষান্ত হলো

বনহুর আর মাংতু এসে ডেকের সম্মুখে দাঁড়ালো। উভয়ের হাতেই তখন রাইফেল।

মাংতু তার অন্যান্য সঙ্গীকে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললো।

এমন সময় নূরী তার ক্যাবিনের জানালা হতে দেখতে পায় বনহুর রুদ্রমূর্তি নিয়ে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে, পাশে তার মাংতু। দু'জনার দেহেই রক্তের ছাপ লেগে রয়েছে।

শত্রু জাহাজখানাকে আক্রমণ করার জন্য তারা রুখে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারে নূরী, বুকটা কেঁপে উঠে হঠাৎ নূরী ভুলে যায় সবকিছু, সে ক্যাবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় সম্মুখ ডেকে, বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠে— না না, তুমি ও জাহাজে যেও না হুর, যেও না..... আমার বড্ড ভয় করেছে।

বিজয়া নূরীর অদূরে ছিলো, নূরী যখন ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলো দ্রুতগতিতে তখন বিজয়া এসে দাঁড়ালো সেই জানালায়, যে জানালা থেকে নূরী দেখতে পেয়েছিলো তার হুরকে।

বিজয়া এসে জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার নজরে পড়লো বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে আছে নূরী। বিজয়া এ দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তার তিলকের সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ? কেন সে বারবার যায় তিলকের পাশে?

কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাপারটা ভাবার বা দেখার সময় হয় না বিজয়ার, কারণ ততক্ষণে পুলিশ জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তাদের জাহাজখানা থেমে যায়। পড়তে পড়তে ক্যাবিনের দেয়াল ধরে নিজকে সামলে নেয় বিজয়া।

বনহুর নূরীকে ঠেলে দিয়ে রাইফেল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ জাহাজে।

পুলিশদের রাইফেল এবং মেসিনগানের গুলী শেষ হয়ে গিয়েছিলো, কাজেই তারা গুলী চালাতে পারে না। বনহুর নিজেও গুলী ছোড়ে না কাউকে লক্ষ্য করে, কারণ তাদের রাইফেলে গুলী নেই।

বনহুরের সঙ্গে মাংতু এবং তার দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশ জাহাজে লাফিয়ে পড়ে।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।

বনহুরের এক-একটি প্রচণ্ড ঘুষিতে ধরাশায়ী হয় পুলিশরা। যারা এতক্ষণ ধরে দর্পে মেসিনগান থেকে গুলী ছুড়ছিলো তারা এখন মরিয়া হয়ে লড়াই করে চলে।

পুলিশদের কয়েকজন ভীষণভাবে আহত হলো। ইতোপূর্বে বনহুর এবং মাংতুর মেসিনগানের গুলীতে কয়েকজন পুলিশ প্রাণ হারিয়েছিলো, তাদের লাশগুলো ডেকের উপর এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে।

বনহুরের সঙ্গে বেশীক্ষণ পারে না পুলিশদল, সবাই পরাজয় বরণ করে।

মাংতু তখন হীরালালের সহকারী পঞ্চাশজনকে বন্ধনমুক্ত করে দেয়।

হীরালালের সঙ্গীরা এক-একজন কম বীরপুরুষ নয়, তারা মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশদেরকে বন্দী করে ফেলে।

সমস্ত পুলিশ ও পুলিশ অফিসার যারা বন্দীদের দায়িত্বার নিয়ে কান্দাই অভিমুখে যাচ্ছিলেন, বনহুর আর মাংতু তাঁদের সবাইকে বন্দী করে ফেলে।

বনহুর আর মাংতু দলবলসহ যখন ফিরে এলো তাদের জাহাজে তখন নূরী আর স্থির থাকতে পারলো না, ছুটে এসে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের গলা— হুর তুমি জয়ী হয়েছো!

হাঁ নূরী। কিন্তু আমার জয়ের পিছনে রয়েছে ফাংহু আর মাংতুর অসীম প্রচেষ্টা। ফাংহু নেই, সে থাকলে এই মুহূর্তে ভীষণ খুশি হতো। নূরী, বড় আফসোস, ফাংহু জীবিত রইলো না।

এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো বিজয়া, দেখছিলো সে সব কিছু। মুহূর্তে বিজয়ার মুখ কালো হয়ে উঠে, ফুলই তাহলে তিলকের সেই হারানো ধন, তার প্রিয়া নূরী! তিলক আজ থেকে সরে গেলো তার কাছ হতে দূরে— অনেক দূরে।

বিজয়া আর দাঁড়াতে পারে না, তার বড্ড কান্না পায়, সে ছুটে চলে যায় তার ক্যাবিনে। আজ আমার মনে পড়ে, ডেকের উপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে তিলক আর ফুলকে নিবিড়ভাবে দেখেছিলো সেদিন। মনে পড়ে, কিছু আগে তিলকের জামার আস্তিন চেপে ধরে কথা বলছিলো ওরা। তার পূর্বেও

অনেক সময় তিলক আর ফুলকে দেখেছে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে। বিজয়ার মনে সন্দেহের ছায়া রেখাপাত করেছে, সমস্ত হৃদয়টা যেন ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠেছে তার। আজ সব ব্যথা-বেদনার হলো অবসান। তিলকের আশা আজ বিজয়ার হৃদয় থেকে সমূলে মুছে গেলো।

হারানোর বেদনা নিয়ে ক্যাবিনের বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে বিজয়া।

তখন বনহুরের বাহুর ক্ষতস্থানে নূরী আঁচল ছিড়ে যত্ন সহকারে বেঁধে দিচ্ছিলো।

মাংতু এসে দাঁড়ায় সেখানে. বলে— পরদেশী বাবু, খুব চোট লেগেছে?

হেসে বলে বনহুর— না, তেমন লাগেনি মাংতু।

মাংতু তবু সাহায্য করে নূরীকে বনহুরের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়ায়।

বাঁধা হয়ে গেলে মাংতু বেরিয়ে যায়।

ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই দেখতে পায় মাংতু, বিজয়া তার বিছানায় শুয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মাংতু এসে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে, তারপর বসে ওর পাশে। পিঠে হাত রাখতেই চমকে উঠে বিজয়া— মাংতু তুমি?

হাঁ। কাঁদছো কেন?

মাংতু, তুমি বুঝবে না।

জানি, আমিও মানুষ।

মাংতু!

জানি কেন তোমার চোখে জল—সব জানি। কেঁদো না, কেঁদে কোনো ফল হবে না রাজকুমারী।

বিজয়া বিস্ময় নিয়ে তাকায় মাংতুর মুখের দিকে— সে রাজকুমারী, একতা মাংতু জানলো কি করে!

মাংতু বিজয়ার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে— তুমি কে আমি জানি, তা ছাড়াও জানি তুমি কি চাও?

জানো, জানো মাংতু আমি কি চেয়েছিলাম?

হাঁ, এ পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা পাবার জন্য মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, তা বলে চাইলেই তা পাওয়া যায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মাংতু, তারপর বলে— নিজকে সংযত করে নাও রাজকুমারী, যা পাবার নয় তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, বরং ত্যাগের মধ্যেই আছে পরম এক শান্তি। কথাটা বলে মাংতু বেরিয়ে যায়।

বিজয়া স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, বিস্ময় জাগে তার মনে— সামান্য একজন খালাসী মাংতু, তার মধ্যে এমন একটা মন লুকিয়ে আছে! সত্যিই তো, এ পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যা চাইলেই পাওয়া যায় না। আকাশের চাঁদ কে না চায়, তাই বলে কি সবাই পায় সেই চাঁদকে। ত্যাগের মধ্যেই আছে পরম এক শান্তি....

এ জাহাজখানা তখন পুলিশ জাহাজটাকে আটক করে এগিয়ে চলেছে নীল নদের প্রবেশ মুখের দিকে।

হীরালালের সঙ্গীরা মুক্তির আনন্দে আত্মহারা। সবাই বনহুর আর মাংতুকে ঘিরে আনন্দ করছে। পুলিশ জাহাজেই পুলিশগণকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

ফাংহুর লাশ সম্মানে নীল নদে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। তার লাশটি যখন নীল নদে নামানো হলো তখন মাংতুর চোখে অশ্রু ঝরে পড়লো, সে অনেক কষ্টে নিজকে সামলে রাখলো।

ফাংহুর সঙ্গে আরও কয়েকজন নিহত হয়েছিলো, তাদেরকেও নীল নদে নামিয়ে দেওয়া হলো।

বনহুর এবার মাংতুকে বললো— মাংতু হীরালালের অনুচরগণ মুক্তি পেয়েছে, এবার পুলিশ জাহাজখানাকে মুক্তি দিয়ে দাও।

মাংতু বনহুরের কথা ফেলতে পারে না, সে পুলিশ ও তাদের জাহাজখানাকে মুক্তি দিয়ে দেয়। যে ক'জন পুলিশ ও পুলিশ অফিসার ছিলেন তাঁদেরকেও সেই জাহাজে বিদায় দেওয়া হলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন এবং মিঃ শরীফ ছিলেন ঐ জাহাজে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এ দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কেউ নয়, নাহলে কার সাধ্য তাদের পুলিশ জাহাজ আটক করে।

ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয়। তাঁরা জাহাজ নিয়ে ফিরে চললেন কান্দাই অভিমুখে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের আশা উপস্থিত তাঁরা ত্যাগ করলেন।

দস্যু বনহুরের জাহাজখানা চললো নীল দ্বীপের উদ্দেশ্যে। বিজয়াকে পৌছে দিয়ে ফিরে যাবে সে কান্দাই—এর আস্তানায়।

বনহুরের বাহুতে যে আঘাত লেগেছিলো তা ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে আসছিলো। তবু মাংতু প্রতিদিন নিজে এসে ওর ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতো।

নূরী আর বিজয়া থাকতো তার পাশে।

বিজয়া আজকাল বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কেমন যেন মনমরা ভাব নিয়ে থাকে সে। বনহুরের পাশে সে আজকাল বেশী আসে না সব সময় দূরে দূরে সরে থাকে।

আজ ক'দিন জাহাজখানা একটানা নীলনদ অতিক্রম করে চলেছে। আকাশ পরিষ্কার, সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠে আকাশে।

ফুরফুরে বাতাসে অনাবিল একটা শান্ত ভাব ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আর একদিন পরই তাদের জাহাজখানা পৌছে যাবে নীলদ্বীপে।

বিজয়াকে নীলদ্বীপে তার পিতামাতার কাছে পৌছে দিতে পারলে বনহুর নিশ্চিন্ত হবে।

বনহুর নিজের ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে বিজয়ার কথাই ভাবছিলো, বিজয়া তাকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলো। বহুদিনের বহু কথা আজ তার মনে আলোড়ন তোলে।

রাজকন্যা বিজয়া, রাজসুখ ত্যাগ করে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলো। তার ব্যথা-বেদনার সমভাগী হয়েছিলো সে। বনহুর ওকে কিছু দেয়নি— নিজকে বড় অপরাধী মনে হয়।

বনহুর ক্যাবিন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে বাইরে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আকাশে চাঁদ হাসছে। বনহুর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় জাহাজের পেছনে ডেকের দিকে।

দেখতে পায় সেখানে কে একজন ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর বুঝতে পারে বিজয়া ছাড়া কেউ নয়। আজ ক'দিন থেকে তাকে সব সময় নির্জনে একা একা থাকতে দেখেছে। নিশ্চয়ই বিজয়া তার উপর অভিমান করেছে।

অন্য সময় হলে বনহুরের এসব লক্ষ্য করার সময় হতো না, তাকে সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। যেমন ক' দিন আগেও বনহুর ছিলো ঠিক আলাদা মানুষ। হিংস্র সিংহের মতই ভয়ঙ্কর ছিলো তার রূপ তখন।

এ ক'দিন কেউ তার পাশে যাওয়ার সাহসী হয়নি শুধু ফাংহু ছাড়া। ফাংহুর মৃত্যু বনহুরকেও কম ব্যথা দেয়নি। সে জানতো. ফাংহু তাকে রক্ষা করার ব্রত নিয়েই নিজেকে উৎসর্গ করে দিলো। ক'দিন ওর সঙ্গে মিশেই সে বুঝতে পেরেছিলো. ওকে। লোকটার পেছনে যদিও একটা শক্তি সর্বক্ষণ তাকে পরিচালিত করছিলো, তবু তার নিজস্ব ক্ষমতাও ছিলো অসীম, তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। যেমন দুঃসাহসী তেমনি শক্তিশালী ছিলো ফাংহু।

এ জাহাজে আরও যারা ছিলো তারাও এক-একজন ভীষণ দুঃসাহসী এবং শক্তিশালী। শুধু তাই নয়, এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলো। বনহুর দেখেছে, সবাই যেন এক অসীম শক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যে শক্তি এতগুলো মানুষকে যন্ত্রচালিতের মত চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কি সে শক্তি, কে সে? আর কেউ না জানতেও বনহুরের কাছে তা গোপন ছিলো না, সে জানে কে সে।

সেই আশা যে তাকে বহুবার বহু কাজে সহায়তা করেছে, তার জীবন রক্ষার জন্য যে বারবার ছুটে এসেছে তার পাশে। আজও যে তার পুলিশের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য এত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশার প্রতি বনহুরের কম সহানুভূতি ছিলো না, যদিও সে বনহুরের কাছে নিজকে কোনো সময় প্রকাশ করতে চায়নি বা চায় না।

বনহুর এসে দাঁড়ায় বিজয়ার পাশে।

জ্যোছনার আলোতে চারদিক ঝলমল করছে।

বনহুরের পদশব্দ পেয়ে বিজয়া ফিরে তাকায়, ওকে দেখে তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বনহুর ডাকে— বিজয়া, শোন।

দাঁড়িয়ে পড়ে বিজয়া।

বনহুর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় বিজয়ার পাশে।

বাতাসে বিজয়ার আঁচলখানা উড়ছিলো। জ্যোছনার আলোতে বিজয়ার মুখখানা থমথমে দেখাচ্ছিলো। বনহুরের কথায় মুখখানা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

বনহুর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগে করে।

এ জাহাজে আসার পর বনহুর দামী সিগারেট এবং তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব পেয়েছিলো। কাজেই তার কোনো অসুবিধা ছিলো না। বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলে—বিজয়া, আজকের রাত আমার এবং তোমার জীবনে শেষ রাত। তোমার কাছে আমি অনেক ব্যাপারে ঋণী। থামলো বনহুর, রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সিগারেট পান করে চললো, কয়েকমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো— তুমি আমাকে যথেষ্ট দিয়েছো, তোমার প্রাণঢালা ভালবাসা আমাকে অভিভূত করেছে। বিজয়া, তুমি আমার উপর অভিমান করো না, যখনই আমাকে ডাকবে আমি আসবো তোমার পাশে। এই নাও.... বনহুর নিজের হাতের আংগুল থেকে আংটিটা খুলে বাড়িয়ে ধরলো— এটা রাখো, আমার স্মৃতিস্বরূপ দিলাম। এটা সাধারণ আংটি নয়, এর মধ্যে বসানো আছে ওয়্যারলেস। যখন বিপদে পড়বে তখন আমাকে ডেকো, আসবো যেখানেই থাকি না কেন।

এবার বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো, সে বনহুরের হাত থেকে আংটিটা নিয়ে মুঠার মধ্যে চেপে ধরলো, তারপর চোখে অশ্রু, মুখে হাসি নিয়ে বললো— সত্যি ডাকলে আসবে?

আসবো।

তিলক, এই আংটিই হবে আমার জীবনে সম্বল। কথাটা বলে বিজয়া আংটিটা মুঠায় চেপে ধরে ছুটে চলে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, ফিরে তাকাতেই নজরে পড়লো অদূরে দাঁড়িয়ে আছে মাংতু। বনহুর ফিরে তাকাতেই সরে গেলো সে দ্রুতগতিতে।

❑

বিজয়াকে নীল দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে বনহুর মাংতুর কাছে বিদায় চাইলো। মাংতু বনহুরের জন্য পৃথক একটি জাহাজের ব্যবস্থা করে দিলো। সেই জাহাজে বনহুর, নূরী আর কয়েকজন নাবিক রইলো মাত্র।

বনহুর বিদায় মুহূর্তে মাংতুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললো— আশা, তোমার এ ঋণ জীবনে ভুলবো না! আমার অন্তরের শুভেচ্ছা রইলো তোমার জন্য, তোমার ত্যাগের কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে।

মাংতুর মুখখানা তখন রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠেছিলো, পর মুহূর্তে চোখ দুটো ওর অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, দ্রুত সরে গেলো সে সেখান থেকে।

বনহুরের জাহাজখানা যখন মাংতুর জাহাজ থেকে দূর সরে যাচ্ছিলো তখন বনহুর আর নূরী এসে দাঁড়ালো ডেকের উপর। তারা দেখতে পেলো, মাংতু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার জাহাজের ডেকের রেলিংয়ের পাশে।

বনহুর হাত নাড়তে থাকে।

নূরীও হাত নেড়ে মাংতুকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। ক্রমান্বয়ে মাংতুর জাহাজ থেকে বনহুরের ছোট্ট জাহাজখানা ধীরে ধীরে সরে যায়। এক সময় ঝাপসা হয়ে আসে মাংতুর জাহাজটা বনহুর আর নূরীর চোখে।

বনহুর চোখে বাইনোকুলার তুলে ধরে, দেখতে পায় মাংতু তখনো তার জাহাজের ডেকে রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠে বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে।

নূরী তাকিয়ে ছিলো বনহুরের মুখের দিকে। ওর ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখে বললো নূরী— হাসছো যে?

নূরী, এখনো মাংতু ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেখি। নূরী বনহুরের হাত থেকে বাইনোকুলার নিয়ে চোখ ধরে বলে উঠে— তাইতো, মাংতু এখনো তার ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, জাহাজখানা দেখছে।

হাঁ। গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

নূরী বললো— সত্যি, মাংতু ছেলেটা বড় ভাল। ও না হলে আমাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হতো। ওকে আমার খুব ভাল লেগেছিলো।

বনহুর হেসে বললো— ছেলে নয় মেয়ে!

নূরী অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, বললো— মাংতু ছেলে নয় মেয়ে!

হাঁ। বনহুর একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো। বাইনোকুলারটা তখন তার গলার সঙ্গে ঝুলছিলো।

নূরী বল চললো— মাংতু মেয়ে— আশ্চর্য! সত্যি কত দুঃসাহসী সে। হুর, তুমি যখন জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মেসিনগান চালাচ্ছিলে তখন মাংতুকেও দেখেছি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে অসীম বীরত্বের সঙ্গে মেসিনগান চালাতে। তাছাড়া সে তোমার পাশে থেকে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ভীষণ লড়াই করে চলেছিলো।

হাঁ, ওর বীরত্ব আমাকেও কম আশ্চর্য করেনি।

আমি ভাবতেও পারিনি মাংতু পুরুষ নয় নারী।

ওর মাথায় সর্বদা পাগড়ী দেখেও তোমার মনে সন্দেহ জাগেনি?

তেমন করে খেয়াল করিনি হয়তো, তাই......

ওর আসল পরিচয় জানলে তুমি আরো অবাক হবে নূরী।

তাই নাকি, ওর আরো কিছু পরিচয় আছে?

যে জাহাজখানা থেকে আমরা একটু আগে বিদায় নিলাম সে জাহাজখানা মাংতুর।

সত্যি?

হাঁ। ফাংহু তারই অনুচর।

বলো কি হুর?

এ জাহাজে যারা কাজ করছে তারা সবাই মাংতুর অনুগত [illegible]

আমি জানতাম ফাংহুই ছিলো ঐ জাহাজের মালিক।

না, ফাংহুর মাংতুর দাস। মাংতুর পরিচালনায় গোটা জাহাজখানা [illegible] পরিচালিত হচ্ছিলো। শুধু তাই নয়, মাংতুর অদ্ভুত কার্যদক্ষতা আমাকে বিস্মিত করেছিলো ও জাহাজখানা তার এক সৃষ্টি।

নূরীর দু'চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠে, বলে সে —মেয়েটি [illegible] একটি.....

হাঁ নূরী, সে এক বিস্ময়।

ওর আসল পরিচয় তুমি জানো?

জানি।

কে সে নারী?

সেই আশা.......

মাংতু আশা?

হাঁ।

কথাটা শুনে নূরী একেবারে থ' খেয়ে যায়। বিশ্বাস হতে চায় না যেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে উঠে সে —আশা এতদিন জাহাজে আমাদের সঙ্গে ছিলো?

শুধু জাহাজের নয়, সে সর্বক্ষণ তোমার পাশে ছিলো তোমার সখী চম্পার বেশে।

এ তুমি কি বলছো হুর?

হাঁ, সেই চম্পাই মাংতু আর মাংতুই হলো আশা। আর সেই আশা কে জানো?

ঢোক গিলে বলে নূরী— না।

আশাই হলো মনসুর ডাকুর কন্যা ইরানী।

বনহুরের কথাগুলো নূরী অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলো। আশাই মনসুর ডাকুর কন্যা! কথাটা শুনে তার কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে আসে। মাংভুর বেশে আশা তাদের সঙ্গে ছিলো এতদিন, এটা যেন ভাবতেই পারে না নূরী। আবার ওকে কাছে পাবার জন্য মনটা ওর উন্মুখ হয়ে উঠে। নতুন করে আবার ওকে দেখার বাসনা জাগে তার মনে।

কিন্তু মনের আশা তার আর পূর্ণ হবার নয়, আশা এখন অনেক দূরে। নূরীকে ভাবতে দেখে বনহুর হেসে বললো— নূরী, এখন আমরা আস্তানায় ফিরে চলেছি, কোনো বাধাই আর আমাদের পথ রোধ করতে পারবে না। জাভেদকে কতদিন তুমি দেখোনি, নিশ্চয়ই সে তোমার উপর অভিমান করে বসে আছে।

নূরী একটু হেসে বললো— জাভেদ কি শুধু আমার উপর অভিমান করেছে, তোমার উপর সে কি.....

নূরীর কথা শেষ হয় না, বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

দমকা বাতাসে নূরীর আঁচলখানা বনহুরের চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। দু'জনাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে।

বনহুর আস্তানায় ফিরে প্রথমেই জাভেদকে তুলে নিলো কোলো। এই ক'মাসে জাভেদ অনেক বড় হয়েছে। পা পা করে হাঁটতে শিখেছে সে।

নাসরিন ওকে এতদিন মায়ের স্নেহে পালন করেছে, জাভেদ তাই ওকে বেশী করে চেনে। নূরীর কোলে যেতেই চাইলো না সে প্রথম প্রথম, পরে বোধ হয় সে চিনতে পেরেছে তার মাকে, তাই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বনহুর ওকে চুয়োয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে ডাকলো— আব্বু, তুমি বড্ড দুষ্টো হয়েছো।

নূরী একটু হেসে বললো— ঠিক তোমার মত।

বনহুর আর নূরী বেশ কিছুক্ষণ মেতে রইলো জাভেদকে নিয়ে।

নাসরিন ও যোগ দিয়েছিলো তাদের সঙ্গে।

এক সময় নূরী নাসরিনের কানে মুখ নিয়ে বললো— বুঝতে পেরেছি তুই মা হতে চলছিস্।

আঁচলে মুখ ঢেকে হাসলো নাসরিন, কারণ সত্যিই সে অন্তঃসত্ত্বা ছিলো।

জাভেদ বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে আধো আধো কণ্ঠে কত কথা বলে, হাসে সে বারবার ফিক্‌ফিক্ করে।

বনহুর যখন জাভেদকে নিয়ে মেতে ছিলো তখন দরবারকক্ষে তার অনুচরগণ তার অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলো। অনেক দিনের অনেক কাজ জমা হয়ে আছে তার জন্য।

রহমান এসে পায়চারী করছে বনহুরের কক্ষের দরজার বাইরে। তার চোখেমুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে। বনহুরকে এ মুহূর্তে তার নিতান্ত প্রয়োজন।

বনহুরকে আনন্দমুখর দেখে তাকে ডাকতে সাহসী হচ্ছে না সে।

এমন সময় কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে নাসরিন। স্বামীকে সে উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করতে দেখে থমকে দাঁড়ায়, বলে— কি হয়েছে?

নাসরিন, একটি দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ?

হাঁ।

নাসরিনের চোখেমুখে একটা দুশ্চিন্তার ছায়াপাত হয়। সরে আসে সে ভীত-পদক্ষেপে স্বামীর পাশে, উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে— কি দুঃসংবাদ, বলো?

কান্দাই শহর থেকে আমাদের গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে এসেছে বৌরাণীর নাকি খুব অসুখ, বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

বলো কি, মনিরা অসুস্থ?

হাঁ, কি অসুখ হয়েছে ডাক্তার ধরতে পারেনি।

তাহলে তো বড়ই দুশ্চিন্তার কারণ.......... একটু থেমে বললো নাসরিন— আমি সর্দারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হাঁ, তাই করো নাসরিন। আর শোন, হঠাৎ গিয়ে তুমি যেন কিছু বলো না।

আচ্ছা বলবো না।

কথাটা বলে নাসরিন পুনরায় কক্ষে ফিরে যায়।

বনহুর তখন জাভেদকে আদর দিচ্ছিলো।

নাসরিন এসে দাঁড়ালো—সর্দার।

বনহুর ফিরে তাকালো নাসরিনের মুখের দিকে।

নাসরিন বললো— সর্দার, রহমান আপনাকে বাইরে ডাকছে।

রহমান?

হাঁ।

বনহুর জাভেদকে নূরীর কোলে দিয়ে বলে— চলো।

নাসরিনের সঙ্গে বনহুর বেরিয়ে যায়।

নূরী জাভেদকে নিয়ে মেতে উঠে আনন্দে।

বনহুর আর নাসরিন কক্ষ হতে বেরিয়ে আসতেই রহমান বনহুরকে কুর্ণিশ জানায়।

বনহুর বলে উঠে— কি সংবাদ রহমান?

একটি অশুভ সংবাদ আছে সর্দার।

অশুভ সংবাদ!

রহমান বলে— বৌরাণী ভয়ানক অসুস্থ।

মনিরা অসুস্থ?

হাঁ সর্দার, ডাক্তার বলেছে তার বাঁচার আশা খুব কম।

বনহুর আর দাঁড়ালো না, সে ফিরে চললো কক্ষমধ্যে।

নূরী পদশব্দে ফিরে তাকাতেই বনহুরের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি সরে এলো নূরী কিন্তু সহসা কোনো প্রশ্ন করতে পারলো না।

বনহুর দ্রুত ড্রেস পাল্টে নিলো। মাথায় পাগড়ীটা বেঁধে নিয়ে রিভলভার— তুলে নিলো হাতে, তারপর কোমরের বেল্টে রিভলভার ভরে নিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই নূরী বললো— কোথায় যাচ্ছো হুর?

বনহুর বললো— কান্দাই শহরে। মনিরা অসুস্থ।

কথা কয়টি বলেই বেরিয়ে গেলো বনহুর।

নূরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পুতুলের মত। জাভেদ মাকে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যেতে দেখে কাঁদতে শুরু করে দিলো।

বনহুর আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এলো।

রহমান ইতোপূর্বেই তাজকে প্রস্তুত করে নিয়ে আস্তানার বাইরে অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর তাজের পাশে এসে দাঁড়াতেই তাজ অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো।

রহমান তাজের লাগাম ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর মুহূর্তে বিলম্ব না করে উঠে বসলো তাজের পিঠে।

তাজ সম্মুখের পা দু'টি উঁচু করে আনন্দ প্রকাশ করলো।

বনহুর বললো— রহমান, মনিরা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরবো না।

তাজ এবার ছুটতে শুরু করলো।

❑

মনিরার শয্যার পাশে এসে জড়ো হয়েছেন তার আত্মীয় স্বজন সবাই। শিয়রে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন মরিয়ম বেগম।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব শিয়রে দাঁড়িয়ে, তাঁর চোখে ও অশ্রু। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যারা মনিরাকে দেখতে এসেছেন তাঁরা সবাই বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলের চোখেমুখেই একটা দুশ্চিন্তার ভাব ছড়িয়ে আছে।

নূর এখন বেশ বড় হয়েছে, সে বুঝতে শিখেছে অনেক কিছু। মায়ের অসুখ ভয়ানক হয়েছে বুঝা তার বাকি নেই, তাই নূর দূরে বসে ভাবছে মায়ের কথা।

শহরের বড় বড় ডাক্তার এসেছেন, তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত চিকিৎসা করে চলেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

মনিরার দেহ ক্ষীণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি বসে গেছে, কালিমা পড়েছে চোখের নীচে। রক্তাক্ত গণ্ডদ্বয় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ডাক্তাররা হতাশ হয়ে পড়েছেন, কি রোগ হয়েছে কোনো ডাক্তার ধরতে পারছেন না।

ডাক্তারদের মুখেও চিন্তার ছাপ বিদ্যমান।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে একে একে আত্মীয়স্বজন সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন। মনিরার বান্ধবী যারা এসেছিলো তারাও একে একে চলে গেলো।

ডাক্তাররাও বিদায় গ্রহণ করলেন একসময়। আবার আসবেন বলে কথা দিয়ে গেলেন তাঁরা।

রাত বাড়ছে।

সমস্ত কান্দাই নগরী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। চৌধুরী বাড়ীর দু'একজন চাকর ছাড়া সবাই ঘুমে অচেতন। আজ ক'দিন হলো তারা ঘুমোতে পারেনি। বাড়ীতে কঠিন রোগী, কাজেই সবাই সব সময় উদ্বিগ্নভাবে রাত জেগে সময় কাটিয়েছে।

আজ আর জাগতে পারছে না ওরা, তাই যে যেখানে পেরেছে ঢলে পড়েছে নিদ্রায়।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবও ক'দিন অবিরত জেগেছেন, আজ তিনি বসে বসে ঝিমুচ্ছিলেন, মরিয়ম বেগম তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন— সরকার সাহেব, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আবার কখন কি হয় ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে।

সরকার সাহেব সত্যি আজ বড় ক্লান্ত। বয়স হয়েছে অনেক— কাজেই ক'দিন একটানা রাত জেগে তাঁর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিলো। মরিয়ম বেগমের কথা তিনি ফেলতে পারলেন না, চলে গেলেন বিশ্রামের জন্য।

নূর কিন্তু এতক্ষণও বসে ছিলো মায়ের পাশে, করুণ চোখে তাকিয়ে ছিলো সে মায়ের রোগকাতর পাংশু মুখখানার দিকে। না জানি তার মার কি

বনহুর মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—মা, এসেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। মনিরা কেমন আছে মা?

ভালো না বাবা! ডাক্তার বলেছে বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

বনহুর এবার মায়ের পা ছেড়ে মনিরার পাশে গিয়ে বসে ঝুঁকে দেখতে থাকে মনিরাকে, তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে— মনিরা..... মনিরা আমি এসেছি..

মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছতে থাকেন।

বনহুর বারবার ডাকে—মনিরা... মনিরা,

কে জবাব দেবে— মনিরা অজ্ঞান।

হঠাৎ আপন মনেই সে বলে উঠে একবার— মনির......আমার মনির তুমি.. হারিয়ে গেছো... আর কোনোদিন....তুমি আসবে না... না না.... উঃ

কেন.... কেন তুমি আসবে না... বুকটা আমার ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে ... আ ঃ ....আঃ

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো মনিরার জড়িত কথাগুলো। দু'চোখ বেয়ে তার ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিলো মনিরার গণ্ডে, কপালে, চুলে।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে পাশের কামরায় চলে যান।

বনহুর মনিরার রোগপাংশু বিবর্ণ গণ্ডে চুমো দিয়ে বারবার ডাকে।

রাত ভোর হয়ে আসে, একসময় জ্ঞান ফিরে আসে মনিরার, চোখ খোলে তাকায় সে।

বনহুর সারাক্ষণ মনিরার মুখের উপর ঝুঁকে ছিলো, ওকে চোখ মেলতে দেখে বনহুরের আনন্দ আর ধরে না, তার নাম ধরে বলে— মনিরা, এই দেখো আমি এসেছি। মনিরা...

মনিরা এত অসুখেও স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারে, চোখ দুটো তার মেলে যায় আপনা আপনি, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে— তুমি এ......সে..... ছো...

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ে মনিরার মুখের উপর— মনিরা, আমি এসেছে.. ওর মাথাটা তুলে ধরে বনহুর নিজের বুকের কাছে।

মনিরার মুখে একটা অপূর্ব আনন্দদীপ্ত ভাবে ফুটে উঠে, কতদিন পর তার কামনার তার সাধনারজনকে নিবিড় করে পেয়েছে। বনহুরের বুকে মাথা রেখে প্রাণভরে নিশ্বাস নেয় মনিরা।

রাত ভোর হয়ে আসছে।

বনহুরের মন চঞ্চল হয়ে উঠে। বিদায় চায় সে মনিরার কাছে।

মনিরা জানে, ওকে ধরে রাখলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাই সে স্বামীকে বিদায় দিলো।

বনহুর কথা দিলো প্রতি রাতে সে আসবে। যেমন করে হোক আসবে সে মনিরার পাশে। মরিয়ম বেগমের কাছে এসে বিদায় চাইলো বনহুর।

মরিয়ম বেগম আপত্তি করলেন।

বনহুর তখন রাতের ঘটনাটা সংক্ষেপে বললো মায়ের কাছে। মা ভাল করে লক্ষ্য করতেই আঁতকে উঠলেন, এতক্ষণ তিনি লক্ষ্য করতেই পারেননি! বনহুরের কাঁধের কাছে জামা ছিঁড়ে মাংশ কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, তার কালো পোশাকে রক্তের দাগ তেমনভাবে বুঝা যাচ্ছিলো না।

মরিয়ম বেগম পুত্রের এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন— এ অবস্থায় তোকে আমি ছেড়ে দেবো না মনির।

মা, তুমি বুঝেও কেন অবুঝ হচ্ছো! জানো, ভোর হবার পূর্বেই পুলিশ এসে চৌধুরীবাড়ী ঘিরে ফেলবে। তোমার ছেলেকে তুমি পারবে পুলিশের হাতে তুলে দিতে? যদি পারো আমাকে ধরে রাখো.....

মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছে বিদায় দিলেন— যাও, কিন্তু রোজ একটিবার করে আসবে।

আসবো মা, দোয়া করো।

বনহুর একবার মনিরার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়, যে পথে এসেছিলো সেই পথে।

আস্তানায় ফিরে আসতেই নূরী ছুটে আসে, বনহুরের অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠে সে, চট করে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। বনহুরের কাছে গিয়ে সাবধানে তার গা থেকে জামাটা খুলে ফেলে, কাঁধে চোখ পড়তেই শিউরে উঠে— একি করে হলো?

বনহুর দেয়ালের বড় আয়নাটার দিকে যেতে যেতে বলে—

পুলিশের গুলী, বলো কি হুর?

হাঁ, সব পরে বলবো।

মনিরা কেমন আছে?

ভাল না।

এলে কেন তবে?

প্রতিদিন যাবো কথা দিয়ে এসেছি।

নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের দেহ থেকে রক্তের ধারা মুছে দিতে লাগলো।

বনহুর বড় আয়নাখানার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের দেহের ক্ষতস্থানে লক্ষ্য করে বললো— একটুর জন্য গুলীটা আমার দেহ স্পর্শ করেছে। এ কিছু না, সেরে যাবে দু'দিনেই।

ক্ষতটা একেবারে সামান্য নয়, নূরী কিন্তু খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে জানে, বনহুর কোনোদিনই নিজের দেহের আঘাতকে বড় বলে মনে করে না।

পরদিন ডাক্তার এসে মনিরাকে পরীক্ষা করে আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন— রোগী আজ অনেক ভাল দেখছি।

ডাক্তারের কথায় বাড়ীর সকলে সান্ত্বনা পায়, যাক এবারও তাহলে মনিরা বাঁচলো। এবার নিয়ে তার কয়েকবার কঠিন অসুখ হলো, সব চেয়ে

ডাক্তাররা এবার হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এক রকম প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন তারা।

এরপর থেকে বনহুর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রোজ একটিবার করে চৌধুরীবাড়ী আসতো, মনিরার পাশে বসে নিজের হাতে ঔষধ খাওয়াতো, ফলমূল তুলে দিতো ওর মুখে।

ডাক্তাররা রোজ আসতেন, রোগীর হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁরা বিস্মিত হলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করলেন।

ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে উঠলো মনিরা, নবজীবন লাভ করলো সে আবার।

দিনগুলো বেশ কেটে চললো, বনহুর রোজ কোনো না কোনো উপায়ে একটিবার মনিরার পাশে ছুটে আসতো। আর মনিরা স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হতো।

সেদিন পুলিশ কমিশনার তাঁর অফিসে বসে মিঃ আশরাফী, মিঃ হারুন এবং মিঃ শরাফের সঙ্গে দস্যু বনহুরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। নীলনদে কিভাবে দস্যু বনহুর তাদেরকে নাকানি চুবানি খাইয়ে বিদায় দিয়েছে, কিভাবে বন্দীদের মুক্ত করে নিয়েছে, এসব নিয়েই আলাপ চলছিলো। মিঃ জাফরীর জাহাজ কোথায় উধাও হলো, তাঁরা আজও ফিরে এলেন না কেন, এ নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আরও দু'খানা পুলিশ জাহাজ এখনও ফিরে আসেনি, এ নিয়েও পুলিশ মহলে উদ্বিগ্নতার অন্ত ছিলো না।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠে, কমিশনার রিসিভার তুলে নেন হাতে-হ্যালো, স্পিকিং কান্দাই পুলিশ কমিশনার আরিফ চৌধুরী.....

ওপাশ থেকে ভেসে আসে গম্ভীর কণ্ঠস্বর... আপনার উদ্বিগ্নতার কারণ সেই মিঃ চৌধুরী মি জাফরী তাঁর দলবলসহ পুলিশ জাহাজে নীলনদে ভালই আছেন......তবে তাঁরা আমার বন্দী হিসাবে নীলনদে অবস্থান করেছেন..........

মুহূর্তে মিঃ আরিফ চৌধুরীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

পাশে বসে মিঃ শরীফ এবং অন্যান্য কয়েকজন পুলিশ অফিসার মিঃ আরিফের মুখোভাব লক্ষ্য করে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কে কোথায় হতে ফোন করলো জানার জন্য উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তাঁরা।

মিঃ চৌধুরী বলে উঠলেন— কে আপনি? কোথা থেকে বলছেন?.... হ্যালো, কে আপনি....

ওপাশ থেকে ভেসে আসে সেই কণ্ঠস্বর..... আমি কে একটু পরেই জানতে পারবেন..... শুনুন..... হ্যালো....

মিঃ চৌধুরী বললেন... বলুন?

আপনার প্রিয় অফিসার মিঃ জাফরী ও তার সঙ্গীদের মুক্তি কামনা করলে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য যা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, ঐ অর্থ আপনি আমাকে পাঠিয়ে দিন, তাহলে তাঁরা মুক্তি পাবেন.....

তুমি...... তুমি তাহলে দস্যু বনহুর....

হাঁ..... আপনার অনুমান সত্য.... দস্যু বনহুর কথা বলছি.... এবং আপনার বাংলোর ড্রইংরুম থেকে বলছি।

আমার ড্রইংরুম থেকে কমিশনারের মুখ রক্তাভ হয়ে উঠলো, দস্যু বনহুর আমার বাংলায় কমিশনারের হাত থেকে রিসিভারখানা পড়ে যাচ্ছিলো। তিনি আবার তুলে নিলেন, শক্ত করে ধরে কিছু বলতে গেলেন কিন্তু পারলেন না।

ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠ ভেসে এলো... আপনার বাংলায় যে কোন দিন রাত দুটোয় আসবো, অর্থ মজুত রাখবেন.... গুড্ বাই....

রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

কমিশনার রিসিভার রেখে ঢোক গিলে বললেন— দস্যু বনহুর আমার বাংলো থেকে কথা বললো।

উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের মুখে একটা গভীর আতঙ্কের ভাব ছড়িয়ে পড়লো। সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলো বনহুর তাঁকে কি বললো শোনার জন্য।

কমিশনার সব কথা বলে চললেন।

বনহুরের মনে পড়লো সেই বৃদ্ধার দেওয়া মোড়কটির কথা। বৃদ্ধা বলেছিলো তিন মাস পর ওটা যেন সে খুলে ফেলে, তার আগে নয়।

বনহুর মোড়কটা বের করে আনলো, সে যত্নসহকারে খুলে ফেললো ওটাকে। মোড়কের মধ্যে রয়েছে একটি সংকেতপূর্ণ চিহ্ন তার নীচে লেখা আছে মাত্র দু'টি শব্দ "নীল পাথর"।

বনহুর উবু হয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে সংকেতচিহ্ন লক্ষ্য করেছিলো, এমন সময় তার সম্মুখে এসে বিদ্ধ হয় একটি তীরফলক।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে চোখ তুলে তাকায়।

পরবর্তী বই

নীল পাথর—২